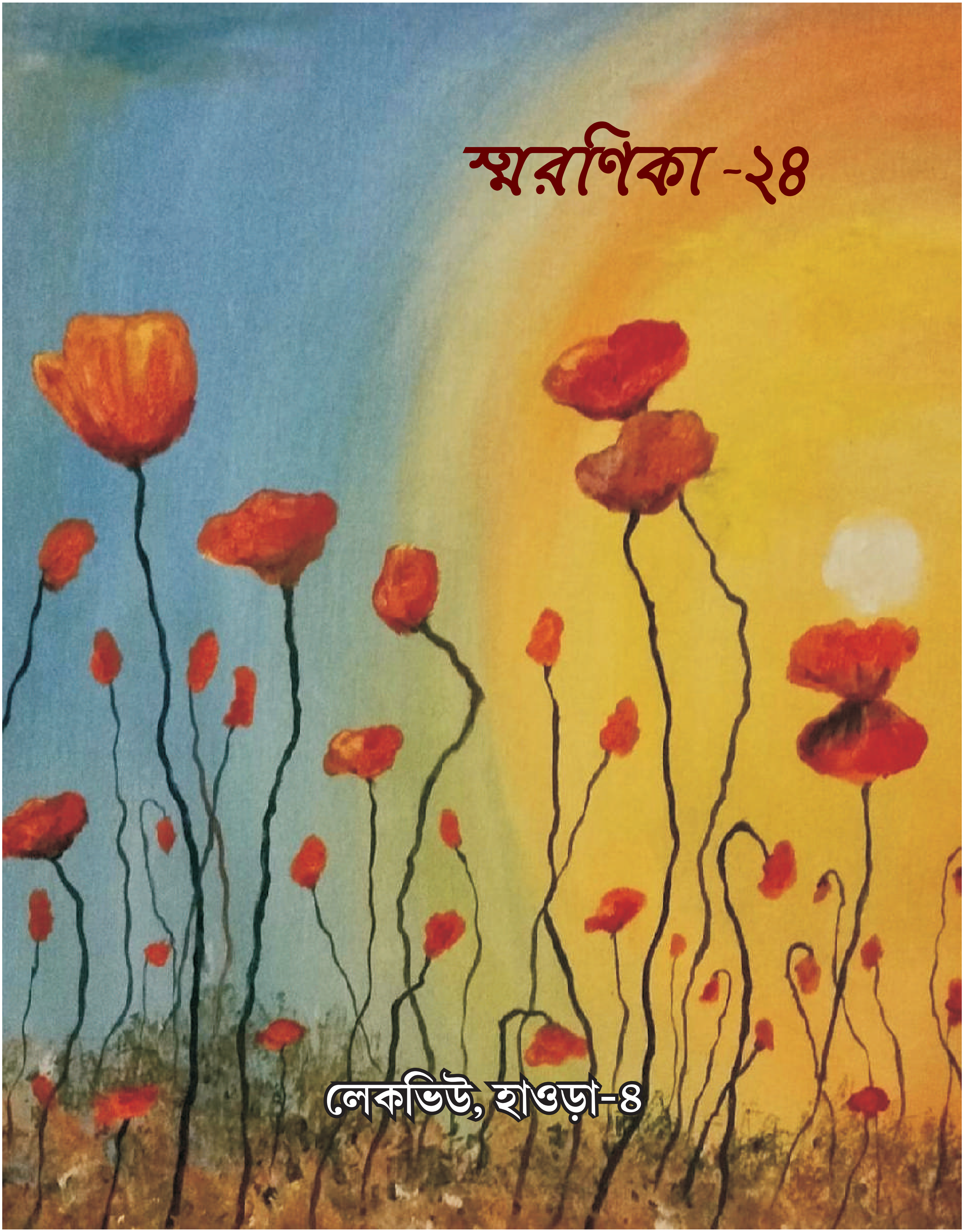

স্মরণিকা -২৪

লেকভিউ, হাওড়া-৪

With Best Compliments From

Phone : 033 2658 0723 / 2871

LYCEUM ENGLISH MEDIUM SCHOOL

AN ISO 9001 : 2015 CERTIFIED INSTITUTION

Affiliated to
Council for the Indian School Certificate Examinations, New Delhi
1, ANDUL ROAD, BAKULTALA, P.O. - D.S. LANE,
HOWRAH-711 109
E-mail : lyceumenglish@yahoo.in
Website : www.lyceumengmedschool.com

We deeply sympathize those families who lost their dear & near ones.

Obituary

Howrah Dumurjala Lakeview Housing Residents' Cultural Association

সম্পাদকীয়

প্রিয় লেকভিউ অধিবাসীবৃন্দ,

'সুখে-দুঃখে আবেগে-স্মৃতিতে' বছরটা শেষ পর্যন্ত কেটেই গেলো। ২০২২ এর শুরুর দিকে শুরু হওয়া রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এ বছর ও অব্যাহত। করোনা পরবর্তী সময়ে মানুষের মনে হয়েছিল মানব সভ্যতার সবথেকে বড় সংকট আমরা কাটিয়ে উঠতে পেরেছি, কিন্তু ছোঁয়াচে রোগের মতো ক্রমবর্ধমান যুদ্ধ আর অশান্তি আর তার লেজুড় হিসেবে মুদ্রাস্ফীতি, খাদ্যসংকট, বেকারত্ব, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, অপরাধপ্রবণতা এক নতুন আকার নিয়েছে। বিশ্ব উষ্ণায়ন আর দূষণ তো অনেক আগে থেকেই গুরুতর সমস্যা ছিল। সাম্প্রতিককালে আমাদের বহুদিনের বন্ধুদেশ বাংলাদেশের রাজনৈতিক চাপানউতোর খানিকটা হলেও আমাদের ভাবিয়ে তুলেছে। তবে এসব ছাপিয়ে সবথেকে বড় সমস্যা তথ্য বিকৃতি বা ভুল তথ্য পরিবেশন, যার জেরে আপামর জনসাধারণকে প্ররোচিত, বিভ্রান্ত করা যায়। এমনটা নয় যে অতীত সর্বতোভাবে সুখের ছিল এবং যা কিছু বর্তমান তার পুরোটাই অন্ধকারে ঢাকা। ইতিহাস বলে মানব সভ্যতার অস্তিত্ব আগেও বহুবার বিপন্ন হয়েছে, সেই বিপন্নতা ঠেলে নিখিল মানুষ নিজের টিকে থাকার রাস্তা নিজেই খুঁজে নিয়েছে। যখন দেখি অল্পবয়সী ছেলে মেয়েরা রাস্তার কুকুর বেড়ালের যত্ন নিচ্চে, রাস্তার ধারে সদ্য পোঁতা গাছগুলোকে বেড়া, জল দিয়ে প্রাণপণে আগলে রাখছে, আত্মীয়জনকে অনুরোধ করছে বিয়েতে উপপহার দেওয়ার পরিবর্তে তারা যেন তাদের সাধ্যমতো NGO তে দান করে তখন মনে হয় এই তো অন্ধকার কাটিয়ে আমরা ঘুরে দাঁড়াচ্ছি জোতির্ময় পথে। কামনা করি এই মানবতার উদযাপন যেন হয়ে ওঠে আমাদের পরবর্তী মহামারী।

এ বছরও লেকভিউ-এর সাংস্কৃতিক মনস্ক মানুষজনদের কবিতা, নাটক, গল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদিতে সেজে উঠেছে এই সংকলনটি। এঁনাদের কেউ কেউ আপনাদের কাছে লেখক হিসেবে সুপরিচিত, কেউ বা নেহাতই নবীন এবং কাঁচা। তাঁদের সবাইকে তাঁদের দৈনন্দিন ব্যস্ততা থেকে সময় বের করে এই সংকলনটিকে সমৃদ্ধ করার জন্য অনেক ধন্যবাদ জানাই। কথায় আছে একজন পাঠক হাজার জীবন এক জীবনে বেঁচে নেয়। একজন মানুষ যখন লেখেন সে তাঁর হৃদয় উপুড় করে বইয়ের পাতায় ঢেলে দেন। সেখানে কোনো ফাঁকি থাকে না। আমার বিশ্বাস মনের গভীর থেকে আপনাদের অবশ্যই ভাবাবে এই লেখাগুলি। আপনাদের অনুরোধ রইলো সংকলটি পড়ে আপনাদের মতামত জানান যাতে করে আগামী দিনে আরো নতুন লেখক, লেখিকারা আমাদের মধ্যে থেকে উঠে আসে। লেকভিউর পুজো ও সার্বিক উন্নতিকল্পে সহায়তাকারী উপদেষ্টা, আর্থিক সহায়তাকারীদের অসংখ্য ধন্যবাদ। পরিশেষে স্মারকটির প্রকাশে যাঁদের নিবিড় সহায়তা ও অক্লান্ত শ্রম করে এতটা পথ এগিয়ে নিয়ে এসেছেন তাদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।

প্রচ্ছদ অলঙ্করণে ঃ সিদ্ধার্থ সরকার

HOWRAH DUMURJALA LAKEVIEW HOUSING RESIDENTS' CULTURE ASSOCIATION

Executive Committee for FY : 2024-25

President	:	Atanu Mukhopadhay
Vice President	:	Tapas Chowdhury
	:	Arindam Chouhuri
Secretary	:	Siddhartha Sarkar
Jt. Secretary	:	Ashim Dutta
	:	Rajkumar Maity
	:	Debasish Sarkar
	:	Jayanta Mukherjee
Treasurer	:	Bidhan Tunga
Asstt. Treasurer	:	Suvanjan Ghosh
Executive Member	:	Sandipan Banerjee
	:	Subir Hazra
	:	Debasish Mitra
	:	Anamika Koley
	:	Nandita Palit Panda

With Best Compliments From

Engineering Vertical Services Pvt. Ltd.

Puja Commitee

President	Atanu Kumar Mukhopadhyay
Chief Advisor	Sandipan Banerjee, Suvendu Karar, Angshu Bikash Das
Vice President	Tapas Chowdhury, Indrani Mitra Chatterjee, Debashish Mitra, Ashim Dutta
Joint Secretary	Arindam Chaudhuri, Siddhartha Sarkar, Anamika Koley
Assistant Secretary	Suvendu Mallick, Nupur Chaudhuri, Debjani Bhattacharya, Subir Hazra
Treasurer	Bidhan Tunga, Suvanjan Ghosh,
Subscription Collection	Tapas Chowdhury, Raj Kumar Maity, Indrani Mitra Chatterjee, Nupur Chaudhuri, Anamika Koley, Debjani Bhattacharya, Kakali Sarkar, Shrabasti Basu
Cultural Committee	Arya Chatterjee, Tania Mukherjee, Chaitali Tiwary, Suvasri Dutta, Sudipta Basu, Srijan Karmakar, Debmalya Sarkar, Ashim Dutta
Souvenir	Bidhan Tunga, Baisali Maitra, Tania Mukherjee
Food committee	Jayanta Mukherjee, Debashish Sarkar, Raj Kumar Maity, Debasish Mitra, Suvanjan Ghosh, Tapas Chowdhury
Puja Operations	Kakimas , Dhiraj Dutta, Subir Hazra, Suvendu Mallick

হারাধনের চোখ

বিবেকানন্দ পণ্ডা (A/Hs/7/14)

অনাদিদা চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছে, এতক্ষণে মনে হয় ধাক্কাটা সামলেছে। মাসীমা, মানে প্রদ্যোতের মা অনাদিদার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, ''কি বাবা, এখন আগের থেকে একটু সুস্থ লাগছে তো ?'' অনাদিদা চোখ না খুলেই মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। অনাদিদার দু চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে আসছে। বুঝতে পারছি খুব বড় একটা ধাক্কা সামলাতে গিয়ে অনাদিদা খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। মাসীমা বলল, ''একটু কি কিছু খাবে বাবা, তাহলে শরীরটা চাঙ্গা হত।'' অনাদিদা দুদিকে মাথা নাড়ল। আমি বললাম, ''মাসীমা আপনি গিয়ে খেয়ে নিন, রাত তো অনেক হল, আমরা সবাই তো এখানে আছি।'' প্রদ্যোৎ বলল, ''হ্যাঁ মা তুমি আর সঞ্চারী খেয়ে নাও আর দেরি করলে তোমাদেরও শরীর খারাপ করবে।'' মাসীমা চলে গেল, দেখলাম এসি চলছে তবুও অনাদিদা ঘামছে। প্রদ্যোৎ তাড়াতাড়ি এসিটা বাড়িয়ে দিল। তন্ময় অনাদিদার কানের কাছে মুখ এনে ফিস ফিস করে বলল, ''কি ব্যাপার অনাদিদা, এভাবে বমি করে মাথা ঘুরে পড়ে গেলে কেন ?'' অনাদিদা অনেকক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর চোখ মেলে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, ''হারাধনের চোখ।'' কথাটা বলেই অনাদিদা আবার চোখ বন্ধ করল। আবার ''হারাধনের চোখ!'' আমরা তিনজন কিছু বুঝতে না পেরে এ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। বেশ কিছু সময় কেটে গেল একসময় আমি বললাম ''প্রদ্যোৎ, তুই যা এবার গিয়ে শুয়ে পড়, রাত প্রায় ১টা বাজে। মাসীমা, সঞ্চারী ও হিন্দোল তোর জন্যেই জেগে আছে। আমি আর তন্ময় তো রইলাম। অনাদিদা যা বমি করেছে তাতে রাতে মনে হয় কিছু খেতে পারবে না। ঘুমোলে শরীর ঠিক হয়ে যাবে, আর তাছাড়া যদি কোন অসুবিধা হয় তোদের ডেকে তুলবো।'' প্রদ্যোৎ কিছুটা গাঁইগুঁই করে শেষে ঘুমোতে গেল। আসলে ওর ১২ বছরের ছেলে হিন্দোলের জন্মদিনে এসে অনাদিদাকে এমন অসুস্থ হতে দেখে শুধু প্রদ্যোৎ নয়, আমরাও বেশ ঘাবড়ে গেছি। প্রদ্যোৎ অনেকবারই আমাদের ওর শ্যামবাজারের বাড়িতে ডেকেছে, কিন্তু কখনোই আর আমাদের সবার একসাথে আসার সুযোগ হয়ে উঠছিল না। অনাদিদা থাকে দাদার কাছে সেই মেদিনীপুরের অজ এক গাঁয়ে, তাছাড়া এখন একটু বয়স হয়েছে তাই সহজে গ্রামের বাইরে বের হতে চায় না। অবশেষে আমরা সবাই অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে আজকে এখানে আসার জন্যে রাজি করিয়েছি। তবে এরকম যে একটা বিচ্ছিরি ব্যাপার ঘটে যাবে তা আমাদের সবার কল্পনার বাইরে। দু চারজন আমন্ত্রিত অতিথিদের সবার খাওয়া শেষ হবার পর আমরা চারজন আড্ডা দিতে দিতে খেতে বসেছিলাম। সঞ্চারীর হাতের রান্না বেশ ভালই, চেটে পুটে সব সাফ করে দিচ্ছিলাম। পাঁঠার ঝোলটা যা হয়েছিল তা বলার নয়। অনাদিদাও বেশ মন দিয়ে খাচ্ছিল। খাওয়া প্রায় শেষের দিকে, এমন সময় তন্ময় সঞ্চারীকে লক্ষ্য করে বলল, ''তুমি ঝোলটা যা বানিয়েছ না, একেবারে লা জবাব।'' প্রদ্যোৎ পাশ থেকে ফোঁস করে

উঠে বলল, ''সব ক্রেডিট শুধু ওকে দিলেই চলবে না বাজার থেকে দেখে দেখে কচি কালো পাঁঠা কাটিয়ে আমিই নিয়ে এসেছি।'' খাওয়া শেষ করে ঘরে এসে বিছানায় বসে অনাদিদা কাঁপতে লাগল, ''শরীরটা খারাপ লাগছে।'' বাথরুমে যেতেই হুড়হুড় করে বমি করে ফেলল, টলতে টলতে এসে বিছানায় বসতে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেল। পড়েই যাচ্ছিল, তন্ময় পাশ থেকে নেহাত ধরে ফেলল তাই, তা না হলে কি হত কে জানে! তারপর জলের ঝাপটা দিতে কিছুক্ষণ পরেই জ্ঞান ফিরল। সঞ্চারী কয়েকটা অ্যান্টাসিড বড়ি খাইয়ে দিয়ে বলল ''মনে হয় মাংস খেয়ে বদ হজম হয়ে গেছে।'' অনাদিদা বিছানায় শুয়ে মাথা নাড়তে নাড়তে ক্লান্ত গলায় মিনমিন করে বলল, ''হারাধনের চোখ।'' সঞ্চারী শুনতে না পেলেও আমি পরিষ্কার শুনতে পেয়েছিলাম।

রাতে অনাদিদা অঘোরে ঘুমিয়েছে, কোন অসুবিধা হয় নি। সকালে অনাদিদা একটু দেরি করে ঘুম থেকে উঠল। তন্ময় হাত মুখ ধুয়ে এসে বলল, ''কি অনাদিদা, এখন কেমন লাগছে?'' অনাদিদা আলমোড়া ভেঙে বলল, ''কাল রাতে কুম্ভকর্ণের ঘুম ঘুমিয়েছি, এখন বেশ ফ্রেশ লাগছে। তবে যে ভাবে প্রদ্যোতের বাড়িতে এসে এই বমি টমি করে শরীর খারাপ বাধিয়ে গোল বাধালাম তাতে সত্যি খুব লজ্জা লাগছে।'' সঞ্চারী চা নিয়ে দরজার কাছেই ছিল, সব শুনে বলল, ''আপনি কোন গোল বাধাননি দাদা, শরীর খারাপ তো হতেই পারে। তবে আপনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলায় সত্যিই একটু ভয় পেয়ে গেছিলাম। এবারে প্রেসার ইত্যাদি একটু চেক করিয়ে রাখবেন। এখন মুখ ধুয়ে এসে চা খান দেখি।'' অনাদিদা গামছাটা কাঁধে নিয়ে বাথরুমে যেতে যেতে বলল, ''না বৌমা, শরীর আমার শক্তই আছে। সুগার আর প্রেসারের ঝামেলাটা এখনো আমাকে পোয়াতে হয় না। আমি জানি কাল কেন এমন হল। চোখের সামনে হঠাৎ ভেসে উঠল হারাধনের দুটো চোখ।'' কথাগুলো বলে তো অনাদিদা বাথরুমে ঢুকে গেল আর এদিকে আমাদের অবস্থা যাকে বলে কেঁদে বাঁচি। সঞ্চারী তো কথাগুলো শুনে চায়ের ট্রে টা টেবিলে রাখতে গিয়েও স্থানুর মত দাঁড়িয়ে পড়ল।

সকালের খাবার টেবিলে বসে অনাদিদাকে আগের মত মজলিশী মেজাজে পাওয়া গেল। গরম গরম লুচির সাথে ছোলার ডাল খেতে খেতে আমাদের টেবিলে কথার ফুলঝুরি ছুটছিল। সঞ্চারী খান কতক গরম লুচি অনাদিদার প্লেটে দিয়ে বলল, ''দাদা সকালে আপনি কি একটা বলছিলেন হারাধনের চাখ না কি যেন। ব্যাপারটা একটু বলুন না।'' অনাদিদা খাওয়া থামিয়ে থমকে গিয়ে বলল, ''ও তেমন কিছু নয় বৌমা, মুখ ফস্কে বলে ফেলেছি।'' তন্ময় বলল, ''কাল রাত থেকে তো তুমি মুখ ফস্কে একই কথা বার বার বলছ, আমরা তো তোমার তেমন কিছু নয় কথাটার ব্যাপারেই জানতে চাইছি।'' অনাদিদা বলল, ''ব্যাপারটা একটা আছে, তবে তা সুখকর নয়, তোরা যখন জানতে চাইছিস বলছি।'' প্রদ্যোৎ ইঙ্গিত করে সঞ্চারীকে বসতে বলল, ''অনাদিদার গল্প শুরু হল, আগে শুনে নাও তারপর রান্নাঘরে যেও।'' সঞ্চারী গল্পের টানে টেবিলের পাশে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে গালে হাত দিয়ে বসে পড়ে।

অনাদিদা বলে চলে, ...

সালটা ১৯৮০ বা ৮২ হবে। আমার তখন ভবঘুরের জীবন। জরিপের কাজ ছেড়ে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছি। হঠাৎ বস্তারের একটা মাইকা খনিতে কাজ জুটে গেল। কাজ মানে কুলি মজুরদের হিসেব নিকেশ রাখা। কে কখন আসছে কে কখন যাচ্ছে তা হিসেব করে তাদের টাকা মেটানো, আর কোথায় কত কুলি মজুর লাগাতে হবে সেই সব দেখা শোনা করা। বস্তার এখন ছত্তিসগড়ে, কিন্তু তখন তা ছিল মধ্যপ্রদেশের মধ্যে। আমাদের খনিটা ছিল জগদ্দলপুরে থেকে প্রায় ১৫০ মাইল দূরে জঙ্গলের মধ্যে। জায়গাটার নাম পাখাঞ্জোর, চারিদিকে ছোট ছোট পাথুরে টিলা আর শাল ও মহুয়ার জঙ্গল। আসে পাশে বেশ কয়েকটা বাঙালী গ্রাম, সবাই প্রায় পূর্ব বাংলা থেকে এসে বসতি স্থাপন করেছে। আর আছে স্থানীয় আদিবাসী লোকজন, গোঁদ, মুরিয়া, ধারুবা ইত্যাদি। বেশির ভাগই গরিব। খনিতে কাজ, জঙ্গলে কাঠ কুড়িয়ে দিন যাপন করে। জমি খুব পাথুরে আর অনুর্বর, আবাদ প্রায় হয় না বললেই চলে। আমি থাকার জন্য একটা ভদ্রস্থ ভাড়া বাড়ি খুঁজছিলাম। অনেক খোঁজার পর মহিতোষ মল্লিকের বাড়িতে আশ্রয় হল। ইটের দেওয়ালের ওপর টিনের ছাউনি দেওয়া দোতলা ঘর। গ্রামের মধ্যে ওটাই সব থেকে ভালো বাড়ি। ওপর তলার একটা ঘরে আমি থাকি। থাকি বলতে রাতটুকু আর রবিবার সারাদিন। ঐ দিনটা আবার আমার জামাকাপড় পরিস্কার করতে আর ঘর গোছগাছ করতেই কেটে যেত। খনি কোম্পানিতে সাপ্লায়ারের কাজ করে মহিতোষ মল্লিক দু চার পয়সা করেছে। গ্রামে মাঝে মাঝেই জগদ্দলপুর আর রায়পুর থেকে যাত্রা ও পালা গানের দল আনিয়ে অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। জাঁক জমক করে পূজোর আয়োজন হয়, আর তাতে সারা গ্রামের লোক পাত পেড়ে খায়। হঠাৎ করে মানুষের হাতে টাকা এলে যা হয় আর কি ! মোটকথা মহিতোষদা গ্রামের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি।

কোম্পানির কাজে যোগ দেওয়ার পর প্রথম কিছুদিন নতুন কাজ শেখার তাড়া ছিল, তাই বেশ ব্যস্ত ছিলাম। দুপুরবেলা মাইনের পাশেই একটা দোকানে শ্রমিকদের সাথেই রুটি তরকারি খেতাম। রাতের বেলা মহিতোষদার বাড়িতে খেতাম। এই তোরা যাকে বলিস পেয়িং গেস্ট। মহিতোষদার গিন্নী সরলা বৌদি নিপাট ভালো মানুষ। ওখানে প্রতি বাড়িতে সবাই রাতে রুটি খেত, কিন্তু আমার দুবেলা রুটি সহ্য হবে না বলে বৌদি শুধু আমার জন্য রাতের ভাত বানিয়ে দিত। ওদের একটাই মেয়ে পাখি, বাবা ও মায়ের খুব আদরের। মাইল খানেক দূরে গ্রামের একমাত্র স্কুল, খগেন মুর্ম্মু রাজকীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ে পাখি। পাড়ার বন্ধুদের সঙ্গে বেণী দোলাতে দোলাতে একটা শাল জঙ্গল ভরা টিলার পাশ দিয়ে স্কুলে যায়। জঙ্গল খুব ঘন নয়, তবে শুনেছি জঙ্গলে চিতা, হায়না, ভালুকের মত জন্তু আছে। পাখির সঙ্গে আমি বেশ কয়েক বার মুখোমুখি হলেও সেভাবে আলাপ হয়নি, তবে মেয়েটি বেশ বুদ্ধিমতী তা ওর দু চারটে কথা থেকেই বুঝেছি।

একদিন সন্ধ্যায় কাজ থেকে ফিরে হ্যারিকেন জ্বালিয়ে বাড়িতে চিঠি লিখছিলাম, এমন সময় মহিতোষদা এসে উপস্থিত। এ কথা সে কথার পর বলল, ''অনাদিদা তুমি যদি পাখিকে প্রত্যেক সন্ধ্যায় একটু লেখাপড়া দেখিয়ে দিতে পারো তাহলে খুব ভালো হয়। বুঝতেই তো পারছো আমাদের কেমন ক-অক্ষর গোমাংস দশা। এই গ্রামেও লেখা পড়ার খুব চল নেই। তবে আমার আর

ওর মায়ের খুব ইচ্ছে পাখি লেখাপড়া করে প্রতিষ্ঠিত হোক। একটু বড় হলে ভাবছি ওকে রায়পুরের কোন বোর্ডিং স্কুলে পাঠিয়ে দেব, এই খনির এলাকার পরিবেশে রাখব না।" আমি রাজি হয়ে গেলাম, সন্ধেবেলা একা একা এভাবে বসে থাকার থেকে পাখির সঙ্গে কিছুটা সময় অন্তত কাটবে। বললাম, ‘‘ঠিক আছে দাদা আমার কোন অসুবিধা নেই, কিন্তু পাখি যেভাবে জঙ্গলের পাশ দিয়ে স্কুলে যায় তাতে আমার খুব ভয় হয়।" মহিতোষদা হাসতে হাসতে বলল, ‘‘আমরা তো সেই জন্ম থেকে এখানেই আছি, এখনো কোন জানোয়ার মানুষের ক্ষতি করেছে বলে শুনি নি, তবে হ্যাঁ গ্রাম থেকে মাঝে মাঝে গরু ছাগল উধাও হওয়ার ঘটনা ঘটে।"

পরদিন থেকেই পাখি সন্ধ্যে হলেই শ্লেট পেন্সিল, আর ওর প্রাথমিকের বই পত্র নিয়ে হাজির হত আমার ঘরে। প্রথম দিন সরলা বৌদি ওকে সাথে নিয়ে আমার কাছে এসেছিল। কিন্তু একদু দিনের মধ্যে পাখি ওর জড়তা কাটিয়ে আমার সঙ্গে আলাপ জমালো আর কিছুদিনের মধ্যেই আমি হয়ে গেলাম ওর আঙ্গেল বন্ধু। মাঝে মাঝেই চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করে পড়ত, ‘মছলি জল কা রানী হ্যায়, জীবন উসকা পানি হ্যায়,....’ যাতে বৌদি রান্নাঘর থেকে শুনতে পায়। বুদ্ধিমতী মেয়ে, কয়েকদিনের মধ্যে ১ থেকে ১০০ লিখতে শিখে গেল। মুখে মুখে ছোট ছোট অঙ্ক করত। ইংরাজী অক্ষরগুলো তাড়াতাড়ি শিখে ফেলল। মাঝে মাঝে ওকে বাংলা কবিতা শেখাতাম। এক দু বার শুনেই হারাধনের দশটি ছেলে কবিতাটি ও কণ্ঠস্থ করে ফেলেছিল। তবে পড়ার থেকে গল্পই হত বেশি। ও একতরফা বলে যেত ওর স্কুলের কথা, ওর বন্ধুদের কথা আমি চুপ করে শুনতাম। একটু অন্যমনস্ক হলেই ঘাড়ের ওপর উঠে কানের কাছে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলত ওর কথা, তখন আর না শুনে উপায় থাকত না। ক্রমে আমিও ঐ বাচ্চা মেয়েটার সাথে স্নেহের জালে জড়িয়ে যেতে থাকলাম। সন্ধ্যেতে বাসায় ফিরলে পাখি পড়তে আসতে দেরি করলে আমি কোন কাজ খুঁজে পেতাম না। একদিন পড়তে এসে পাখি খুব উত্তেজিত হয়ে বলল, ‘‘জানো কাকু আমি আজ স্কুলে যাবার সময় তিনটে হরিণ দেখেছি, জঙ্গলের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল, মোতি একটু কাছে যেতেই ওরা তাড়াতাড়ি জঙ্গলে ঢুকে গেল।" আমি বললাম, ‘‘মোতি তোমার বন্ধু বুঝি!" পাখি ওর ঝোলা থেকে স্লেট আর বই বার করতে করতে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো। আমি বললাম ‘‘আচ্ছা পাখি একটা ছোট অঙ্ক করতো দেখি। একটা বাড়িতে গাছে পঁচিশটি কাঁঠাল হয়েছে একটা ভালুক এসে চারটা কাঁঠাল খেয়ে নিল তাহলে ক’টা কাঁঠাল থাকবে?" পাখি স্লেট পেন্সিল নিয়ে অঙ্ক করতে শুরু করে দিল। হঠাৎ স্লেট রেখে বলল, ‘‘জানো কাকু গেল সপ্তায় একটা ভালুক বুধনদের বাড়ির কাঁঠাল খেয়ে গেছে। ওদের মোগলি উঠোনে শুয়েছিল। দেখতে পেয়ে যেই ঘেউ ঘেউ করেছে, অমনি ভাল্লুকটা মোগলিকে আঁচড়ে দিয়েছে। ওর সারা গায়ে রক্ত বেরিয়ে গেছে। এখনো খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে।" আমি চোখ বড় বড় করে বললাম, ‘‘সে কি, এ তো মারাত্মক ঘটনা। কিন্তু তুমি তো জঙ্গলের পাশ দিয়ে স্কুলে যাও তোমার ভয় করে না?" পাখি দুদিকে মাথা আন্দোলিত করে বলল, ‘‘না! আমরা তো সবাই একসঙ্গে যাই দিনের বেলা, ভয় করবে কেন!" একটু পরে পাখি ওর মায়ের ডাকে রাতের খাবার খেতে চলে গেল কিন্তু পাখির জন্য ভয়টা মন থেকে গেল না। খনির কাজে কোন বৈচিত্র নেই, তবে খুব ব্যস্ততা আছে। মাঝে মাঝেই ছোট খাটো দুর্ঘটনা ঘটে, শ্রমিক অসন্তোষ হয়। প্রোজেক্ট ম্যানেজার অনিল সাইনী সে সব সামলানোর ভার

আমার ওপর দিয়ে নিশ্চিন্তে থাকেন। প্রায় বছর খানেকের মধ্যে আমারও একটা ছোট প্রোমোশান হল, লেবার ম্যানেজার থেকে ফিল্ড ম্যানেজার। তবুও কিছু দিন ধরেই এই পরিবেশে হাঁফিয়ে উঠেছিলাম। খনি এলাকায় কুলি মজুরদের মধ্যে মাতলামি, পরকীয়া, ঝগড়াঝাটি আর খুনখারাপি প্রায় লেগেই থাকে। তার ওপর আবার মস্তানদের দাপট। সব মিলিয়ে জায়গাটার পরিবেশকে ভাল তো নয়ই বরং খুব খারাপ বলা চলে। এই কাজ আর ভালো লাগছিল না, ভাবছিলাম ছেড়ে দিই। কিন্তু পাখির সঙ্গে বন্ধনটা এমনই গভীর হয়ে উঠেছিল যে ছাড়ি ছাড়ি করেও ছাড়তে পারছিলাম না। পাখি স্কুলে ভালো রেজাল্ট করে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠেছে। ওকে পড়াতে গল্প শোনাতে ও শুনতে আমার ভালোই লাগে। তখন বসন্ত কাল, শীতের আমেজ যাই যাই করেও রয়ে গিয়েছে। পাখাঞ্জোরের শাল জঙ্গলে পাতা ঝরা রুক্ষ প্রকৃতির বুকে পলাশ আর শিমূল ফুল সবে উষ্ণতা ছড়াতে শুরু করেছে। পাখি'র জন্য উপহার হিসাবে জগদ্দলপুর থেকে এক বাক্স রং পেন্সিল আনিয়েছিলাম। সন্ধ্যেবেলা অফিসের কাজ শেষ করে পেন্সিল বাক্স পকেটে ভরে বাসায় রওনা দিচ্ছি, এমন সময় অনিল স্যার ডেকে পাঠালেন, আর জানালেন কুল্লি মহল্লায় রাম শরণ যাদব নামে এক কুলি ওর বৌকে গঙ্গাচরণ গুপ্তার সঙ্গে আপত্তিকর অবস্থাতে দেখতে পেয়ে দুজনকেই কুপিয়েছে। বৌটা সঙ্গে সঙ্গে মারা গেছে আর গঙ্গাচরণকে জগদ্দলপুরের হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এর পর আর কি! থানা পুলিশ করে যখন বাসায় পৌঁছলাম তখন রাত দশটা। আমার জন্য অপেক্ষা করে মহিতোষদার বাড়ির কেউ খাওয়া দাওয়া করেনি। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে দরজা খুলে দেখি দরজার বাইরে থমথমে মুখ নিয়ে পাখি দাঁড়িয়ে আছে। বললাম, ''কি হল পাখি কিছু বলবে!'' পাখি কিছু না বলে চুপ করে রইল, ওর গাল বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে নামছে। আমি পেন্সিল বাক্সটা হাতে দিলাম। ও নিল, কিন্তু খুলেও দেখল না। মাথায় হাত দিয়ে ওকে আদর করতেই হাউ হাউ করে উঠল, ''মা হারাধনকে বাড়িতে রাখবে না বলেছে।'' কথাগুলো বলেই পাখি কাঁদতে কাঁদতে দৌড়ে চলে গেল।

রাতে খেতে বসে আমি বললাম, ''কি ব্যাপার বৌদি, পাখি কাঁদছে কেন?'' বৌদি একটু ঝাঁকিয়েই বলল ''সে কথা পাখি আর তার বাবাকেই জিজ্ঞাসা কর।'' মহিতোষদা আমতা আমতা করে বলে, ''পাখি আজ স্কুল থেকে ফেরার পথে দেখে জঙ্গলের পাশে একটা একরত্তি ছাগল ছানা ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখে কোলে করে বাড়ি নিয়ে এসেছে। ছানাটা হয়ত পথ হারিয়ে ফেলেছে বা ওর মা কে কোন হিংস্র জন্তু তুলে নিয়ে গেছে। পাখির মা বাড়িতে ছাগল ছানাটাকে রাখতে চাইছে না।'' সরলা বৌদি রান্না ঘর থেকে অভিমানী গলায় বলল, ''আমার চাওয়া আর না চাওয়ায় কি এসে যায়, তুমি যা চাইবে তাই হবে।'' মহিতোষদা কাঁচুমাচু মুখ করে বলে, ''ছানাটা একেবারে দুধের শিশু, পাখি যখন নিয়ে এসেছে তখন থাক না। আমাদের বাড়িতে তো অনেক জায়গা আছে।'' আমি বললাম, ''ও—এই ছাগল ছানার নাম বুঝি হারাধন!'' পাখি ফ্রক দিয়ে চোখের চল মুছতে মুছতে বলল ''হুঁ।'' পরদিন ছিল রবিবার, রাতে কয়েকবার হারাধনের ''ম্যা ম্যা'' ডাক শুনতে পেলেও ঘুম থেকে উঠে এই প্রথম হারাধনকে দেখলাম। কুচকুচে কালো ছাগল ছানা, বয়স এক মাসও হয় নি মনে হয়। সরলা বৌদির রাগ কমেছে, দেখলাম একটা ঝিনুকে করে হারাধনকে দুধ খাওয়াচ্ছে আর পাখি দুহাত দিয়ে হারাধনকে আগলে রেখেছে। আমাকে দেখতে পেয়ে বৌদির রাগ যেন আবার বেড়ে গেল,

''তোমার দাদা তো বলেই খালাস। এইটুকু বাচ্চা এখনো বাইরের খাবার খেতে শেখেনি, একে বাঁচানো কি সহজ কাজ?'' মুখে এমন বললেও হারাধনকে বাঁচানোর কঠিন কাজটা বৌদি কিন্তু নিজের কাঁধেই তুলে নিল। এর পর থেকে স্কুল আর লেখাপড়ার সময়টুকু বাদ দিয়ে পাখির সব সময়ের খেলার সাথী হয়ে উঠল হারাধন। প্রথম কয়েকটা দিন সিঁড়ির কোণে হারাধনের থাকার ব্যবস্থা হলেও পাখির জেদে হারাধনের পাকাপাকি থাকার জায়গা হল মহিতোষদাদের খাটের নিচে। ক্রমে দুধ খাওয়া ছেড়ে দিয়ে হারাধন সর্বভূক হয়ে উঠতে শুরু করল। পাখি সন্ধ্যায় পড়ে এলে মাঝে মাঝে হারাধন সঙ্গে এসে উপস্থিত হত। যদিও হারাধন খুব বাধ্য, পাখি বকলে এক জায়গায় চুপ করে শুয়ে থাকে তবুও ওর কবল থেকে বই খাতা সামলে রাখতে হয়, অসতর্ক হলেই চিবিয়ে ফেলবে। একদিন আমি জিজ্ঞাসা করলাম ''পাখি, তুমি ওই ছাগল ছানার নাম হারাধন রাখলে কেন?'' পাখি উত্তর দিল, ''কাকু, তুমি যে কবিতাটি বলেছিলে 'হারাধনের শেষ ছেলেটি কাঁদে ভেউ ভেউ, মনের দুঃখে বনে গেল রইল না আর কেউ।' আমার হারাধনেরও তো বাবা মা ভাই বোন সব হারিয়ে গেছে।'' ঐ ছোট্ট মেয়েটার কথা শুনে আমি বেশ অবাক হলাম। হারাধন কিছু দিনের মধ্যে আমাকেও পছন্দ করে ফেলল। বাসা থেকে সকালে বেরোনোর সময় দেখতে পেলে লাফিয়ে কোলে ওঠার চেষ্টা করত আর নিস্ফল হলে সদ্য গজান খুব ছোট ছোট সিং দিয়ে গুঁতোনোর চেষ্টা করে যেত। আমি কখনো মজা করে পাখিকে কোলে তুলে নিলে হারাধন রেগে আমায় তাড়া করত। পাখির ওপর হারাধনের অধিকার বোধ ছিল প্রবল, এই কারণে একবার ছোটখাটো একটা দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছিল। একদিন বিকেলে বুধনের সঙ্গে পাখি খেলছিল, আর একটু দূরে হারাধন তিড়িং তিড়িং করে লাফিয়ে ঘাস খাচ্ছিল। বুধনের সঙ্গে পাখির কিছু একটা নিয়ে হঠাৎ ঝগড়া বাধে আর শেষে তা ছোটখাটো হাতাহাতিতে পৌঁছায়। দূর থেকে দেখতে পেয়ে হারাধন তীরের মতো ছুটে এসে বুধনকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়। অবশ্য সামান্য হাত পা ছড়া ছাড়া বুধনের বিশেষ কোন ক্ষতি হয়নি।

দেখতে দেখতে অনেকগুলো দিন কোথা দিয়ে গেটে গেল বুঝতেই পারলাম না। খনি এলাকার কাজ, মহিতোষদা, সরলা বৌদি, পাখি, হারাধন এদের সঙ্গে ক্রমাগত এমন এক মায়াজালে জড়িয়ে যাচ্ছিলাম যে বুঝতে পারলেও কেটে বেরোতে পারছিলাম না। বলতে পারিস এমন ভাবে মোহাবিষ্ট হয়ে পড়েছিলাম যে ঐ মায়ার বন্ধন কেটে বেরোতে চাইছিলাম না। কিন্তু সময় বড় কঠিন, তাই কখনো কখনো গতানুগতিক জীবনের ছন্দেও তাল কাটে। কুলি মহল্লা এমনিতেই খুব নোংরা, বিহারী কুলিগুলো মনে হয় নোংরা থাকতেই পছন্দ করে। তাছাড়া ওদের এলাকায় ড্রেনেজ সিস্টেম নেই বললেই চলে। তার সঙ্গে তীব্র পানীয় জলের অভাব। একবার কোন রোগ ছড়িয়ে পড়লেই তার প্রতিরোধ কঠিন হয়ে পড়ত। হলও তাই, বর্ষা শেষ হতে না হতেই কলেরা ছড়িয়ে পড়ল কুলি মহল্লায়। পরপর বেশ কয়েকজন মারাও পড়ল। অবস্থা এমন হল খনির কাজ বন্ধের মুখে। জগদ্দলপুর আর রায়পুর থেকে ডাক্তারের দল ঘুরে গেল। কোম্পানির তত্ত্বাবধানে কুলি মহল্লার কাছে তাঁবু খাটিয়ে অস্থায়ী হাসপাতালের ব্যবস্থা করা হল। মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা হয়ে গেল এক আদিবাসী সর্দারের কথা, মারান বুরু কোম্পানির ওপর রুষ্ট

হয়েছেন, তাই এমন অবস্থা। কুলি মহল্লায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল কথাটা। এবারে শ্রমিকরা আরো ভয় পেয়ে গেল আর পাখাঞ্জোর ছেড়ে দলে দলে ঘরমুখো হল। অনিল স্যারের মাথায় হাত, বললেন, ''কোম্পানি এবার লাটে উঠবে আর আমরা সব পথে বসব।'' সমস্ত অফিসার আর শ্রমিক ইউনিয়ানের নেতাদের ডাকলেন বোর্ড রুমে আলোচনার জন্য। আমাদের ফিল্ড ইঞ্জিনিয়ার সন্দীপ মোহান্তি ওড়িষ্যার ছেলে, বলল ''স্যার এদের মধ্যে যেভাবে মারানবুরু রুষ্ট হবার খবর ছড়িয়ে পড়েছে তাতে মনে হয় না শুধু ডাক্তার বদ্যি দিয়ে অবস্থা পাল্টানো যাবে।'' শ্রমিক ইউনিয়নের পাণ্ডা মুকেশ ঠাকুর বলল, ''স্যার আমাদের বেশিরভাগ শ্রমিক হয় বিহারী নয় বাঙ্গালী নয়তো ওড়িয়া। তাই মানানপুরু টুরু নয় জাঁক জমক করে কালি পূজো করলেই শ্রমিক মজুরদের ভয় ভাঙ্গতে পারে।'' ইউনিয়নের আরেক পাণ্ডা মহাবীর মণ্ডল স্থানীয় বাঙালী, বল, ''মুকেশ ভাইয়া কিন্তু ঠিক কথা বলেছে স্যার। জঙ্গলের পাশে টিলার ওপর পাখাঞ্জোরের কালিমাতা খুব জাগ্রত। যদি আপনি বলেন তো আমি শ্রমিকদের থেকে চাঁদা তুলে পূজোর আয়োজন করতে পারি। সামনের অমাবস্যাতেই সব আয়োজন করা যেতে পারে।'' অনিল স্যার কিছু সময় চুপ থেকে বলল, ''ঠিক আছে, আমরা পূজোর আয়োজন করব, অমাবস্যাতেই পূজোটা হবে, হাতে দিন দশেক সময় আছে আমি একটি পূজো কমিটি গড়ে দিচ্ছি, সন্দীপ চেয়ারম্যান থাকবে আর মুকেশজী ভাইস চেয়ারম্যান। আর মহাবীর শ্রমিকদের কাছ থেকে কোন চাঁদা তোলার দরকার নেই, পূজোর সব খরচ কোম্পানি দেবে। তুমি বরং খাবার দাবারের ব্যবস্থাটা দেখো। সবাই যেন পাত পেড়ে খেতে পারে।''

কালি পূজোর খবরে বোধ করি কুলি মহল্লায় কিছু আস্থা ফিরল। তাছাড়া বৃষ্টি শুকনো হাওয়ার আগমনেও কোম্পানীর ডাক্তারদের ক্রমাগত নজরদারিতে কুলিদের মহল্লায় কলেরার প্রকোপ এমনিতেই থিতিয়ে গিয়েছিল। এর পরের কয়েকটা সন্ধ্যায় পাখি পড়ার জন্য আমার ঘরে এসেছে, আর সাথে সাথে হারাধন গুটি গুটি পায়ে এসে লাফ দিয়ে আমার সোফাতে চুপ করে বসে ঝিমিয়েছে। পাখির পড়া শেষ হলে পা দিয়ে পাখির পিছু পিছু ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। মাঝের দিন দুই মহিতোষদার দেখা পেলাম না, বৌদির কাছে খবর পেলাম বিশেষ কাজে জগদ্দলপুরে গেছে। দিন কয়েক পরে মহিতোষদা সন্ধ্যের সময় হন্ত দন্ত হয়ে আমার ঘরে ঢুকেই আমাদের প্রোজেক্ট ম্যানেজার অনিল সাইনীকে বেশ কয়েকটা অশ্রাব্য গালাগাল দিয়ে দিল। মহিতোষদা বেশ উত্তেজিত, বললাম, ''দাদা তুমি আগে ঠাণ্ডা হয়ে বসো তার পর শুনবো কি হয়েছে।'' মহিতোষদা একটু ধাতস্থ হয়ে বলল, ''কি আর বলব ভাই, তোমাদের অফিসের ঐ শা---অনিল সাইনীর জন্য আমার রক্ত জল করে রোজগার করা দশ দশটি হাজার টাকা বেরিয়ে গেল। বলে কি না কোম্পানীর তরফ থেকে পূজোর আয়োজন করা হচ্ছে তাই সব সাপ্লায়ারদের চাঁদা দিতে হবে। তার ওপর বলির জন্য বড়সড় পাঁঠা চাই, সেটাও আমার ঘাড়ে চেপেছে।'' আমি চোখ বড় বড় করে বললাম, ''তুমি পাঁঠা কিনতে জগদ্দলপুর গিয়েছিলে!'' মহিতোষদা বিরক্ত হয়ে বলল, ''আরে না রে ভাই, একটা ভাল দেখতে পাঁঠা আমি আদিবাসী পাড়ায় পেয়ে গেছি, টাকাও দিয়ে এসেছি। বলেছি একটু আদর যত্ন করে রাখতে, পূজোর দিন মন্দিরে নিয়ে আসব। আর জগদ্দলপুরে গেছিলাম নিজের একটা কাজে।''

পূজোতে আমার কোন বিশেষ দায়িত্ব ছিল না, ইউনিয়নের মাথারাই সব সামলাচ্ছে। প্রোজেক্টের কাজে আবার গতি ফিরে এসেছে, ট্রাকের আসা যাওয়া বেড়েছে। আমি সেই সব নিয়েই ব্যস্ত থাকি। রবিবার সকালে নিজের জামাকাপড় কাচাকাচি করছি, এমন সময় বৌদি ডেকে পাঠালো। বৌদি সেজে গুজে কোথায় বোরোচ্ছে। আমার দেখে বলল, ''অনাদি আমার বাবা খুব অসুস্থ তাই আমি আজ বাপের বাড়ি যাচ্ছি পাখিকে নিয়ে। তোমার দাদা তো পূজো নিয়ে ব্যস্ত, বলল সব সামলে পরে যাবে। কিন্তু সমস্যা হয়েছে হারাধনকে নিয়ে। হারাধনকে ছেড়ে পাখি যেতে চাইছে না। আমি ওকে বলেছি তোর অনাদি কাকু ওকে দেখভাল করবে না হয় এ কটা দিন।'' আমি বললাম, ''পাখি একটুও চিন্তা করো না, আমি হারাধনকে যত্ন করেই রাখবো। পাখি খুব চিন্তিত হয়ে বলল, কিন্তু দিনের বেলা কি করবে?'' আমি বললাম, সিঁড়ির তলায় ওকে বেঁধে রাখব, ভয় নেই কোথাও পালাবে না।'' পাখি বলল, ''জল আর খাবার দিতে ভুলে যেও না।'' আমি বললাম ''না না ভুলবো না, তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে তোমার দাদুকে দেখে এসো।'' বৌদি বলল, ''খাবার দাবারের চিন্তা তোমাকে করতে হবে না আমি পাশের পাড়ির বুধনের মা কে বলেছি ও ঘাস, ভুসি দিয়ে যাবে।'' পাখি বলল, ''কিন্তু হারাধন তো রাতে একা ঘুমোতে ভয় পাবে, কাঁদবে, কি যে করি!'' আমি বললাম, ''রাতের বেলা না হয় ওকে আমার ঘরে নিয়ে চলে আসব, আমার খাটের তলায় খুমোবে।'' পাখি এবার একটু নিশ্চিন্ত হল। বেরোনোর আগের পাখি অনেকক্ষণ হারাধনকে আদর কর, কি সব বলল আর আমায় বলে গেল, ''তাড়াতাড়ি ফিরে আসব, যদি দেরি হয় আমায় চিঠি দিয়ে জানিও হারাধন কেমন আছে।'' আমি মাথা নেড়ে সম্মতি দিলাম। পাখির দুচোখে জল টলটল করছে। বাড়ি থেকে বেরিয়েও আবার ছুটে ফিরে এসে হারাধনকে আরো একবার আদর করে গেল পাখি।

পূজোর আগে কয়েকটা দিন আমি মহিতোষদা হাত পুড়িয়ে রুটি সব্জি বানিয়ে কোন রকমে রাতের বেলাটা চালিয়ে দিতাম। হারাধন আমাদের পিছু পিছু রান্না ঘরে চলে আসত, ওকেও দিতাম কয়েকটা রুটি, বেশ তরিয়ে তরিয়ে খেত। খাবার পর সঙ্গে করে আমার ঘরে নিয়ে যেতাম। তবে খাটের নিচে নয় আমার সোফাটা ছিল ওর পছন্দের জায়গা, সেখানেই ঘুমোতো। অমাবস্যার দিন আমাদের কিছু অফিসিয়াল কাজ হলেও খনির ভেতরের কাজ পুরো বন্ধ। কুলিদের মহল্লায় আর কোন কলেরার খবর নেই তাই সবাই খুশি। মহিতোষদা রাত থাকতে থাকতে বেরিয়ে গেল, অনেক কাজ আছে। আমি হারাধনকে সিঁড়ির তলায় বেঁধে জল আর বিচুলি আছে কি না দেখে নিয়ে স্নান করে অফিস রওনা হলাম। অফিসে কিছু কাজ সেরে বেলা বারটা নাগাদ মন্দিরে গেলাম। পাখাঞ্জোরের কালি মন্দির একটা উঁচু টিলার উপর, চারিদিকে শাল ও মহুয়ার ঘন জঙ্গল, তবে সামনের দিকে বিশাল প্রশস্ত লনে সামিয়ানা খাটানো হয়েছে। সেখানে রং বেরঙয়ের জামা কাপড় পরে কুলি মজুর ও তাদের পরিবার পরিজন সব উপস্থিত। মাইকে মন্ত্র পড়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছি। জঙ্গল এলাকা বলেই তিথি দেখে রাতের পরিবের্ত দিনে পূজোর আয়োজন হয়েছে। এত লোকজনের মাঝে মহিতোষদাকে কোথাও দেখতে পেলাম না। এমন সময় একটা গোলমাল শুনে একটু এগিয়ে গেলাম। মহাবীরকে দেখতে পেয়ে জানতে চাইলাম

কি হয়েছে। মহাবীর ফিস ফিস করে বলল, ''খুব বড় একটা সমস্যা হয়েছে অনাদি স্যার, বলির পাঁঠায় একটা খুঁত বেরিয়েছে। আমরা কেউ আগে থেকে দেখি নি, কিন্তু পুরুতমশাই ভালো করে দেখে বলেছে কুকুর বা অন্য জন্তু নিশ্চয় কামড়েছিল, পাঁঠাটার ডান পায়ে একটা ঘা আছে। স্নান করিয়ে আনার পর এমন কাণ্ড। মহিতোষদা আমাদের ডোবালো দেখছি। এখন যদি অনিল স্যারের কানে কথাটা যায় তাহলে ও নিজেও মরবে আর অশুদ্ধ পূজোর কথা জানাজানি হলে কুলিরা সব ভয়ে পালাবে, কোম্পানিও বন্ধ হয়ে যাবে।'' ভিড়ের মধ্যে অনেক উঁকি ঝুঁকি দিয়েও মহিতোষদাকে দেখতে পেলাম না।

কুলিদের মধ্যেও একটা গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়েছে, অজানা ঝামেলার শঙ্কায় আমিও আতঙ্কিত হয়ে পড়লাম। মন্দির থেকে একটু দূরে গিয়ে শালের জঙ্গলের আড়ালে একটা সিগারেট টান দিয়ে উদ্বেগ কমানোর চেষ্টা করছি এমন সময় দেখি একদন লোক ঢাক ঢোল বাজিয়ে ছাগলকে চান করিয়ে সিঁদুর মাখিয়ে জবা ফুলের মালা পরিয়ে মন্দিরে নিয়ে যাচ্ছে। উদ্বেগ কমল, যাক বাবা, পাঁঠা একটা পাওয়া গেছে। সিগারেট ফেলে কয়েক পা এগোতেই ছাগল আমার দিকে তাকিয়ে ''ম্যা ম্যা'' করতে লাগল, বেচারা জানেও না আর কয়েক মিনিট পরে কি হতে যাচ্ছে। ছাগলটাকে কাছ থেকে ভাল করে দেখে আমার তখন মাথা ঘুরে যাবার জোগাড়, অস্ফুটে বললাম, ''হারাধন!'' শুনতে পেল কি না কে জানে, আমাকে দেখতে পেয়ে হারাধন ছুটে এসে আমার পাঞ্জাবী কামড়ে ধরে টানতে লাগল। কিছু ভেবে ওঠার আগেই মুহূর্তের মধ্যে সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ে হারাধনকে টানতে টানতে নিয়ে চলে গেল। আমার চিন্তা করার ক্ষমতা পুরো লোপ পেয়েছিল মনে হয়, পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইলাম। জটলার মধ্যে থেকে হারাধনের কাতর শব্দ কানে আসছে। আর সহ্য করতে পারলাম না, মন্দিরের উল্টোদিকে হাটা শুরু করলাম। একটু পরে আমার নাম শুনে ঘুরে তাকালাম, দেখলাম মহিতোষদা দৌড়াতে দৌড়াতে আসছে। বললাম ''এ কি করলে মহিতোষদা!'' আমার দু চোখ বেয়ে কখন যে ধারা নেমেছে টের পাইন। মহিতোষদা কাতর মুখে বলল, ''এ ছাড়া যে আমার আর কোন উপায় ছিল না অনাদি। এত তাড়াতাড়ি নতুন ভালো পাঁঠা কোথা থেকে পাই বল তো! পাঁঠা না পেলে কাজ তো যেতই আর অনিল স্যার আমায় বাঁচতে দিত না, পাখি আর ওর মাকে নিয়ে গাছতলায় দাঁড়াতে হত।'' বললাম, ''তা বলে এভাবে হারাধনের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলে! পাখির অন্তরে যা ক্ষত হবে তার ধাক্কা সামলাতে পারবে তো! তাছাড়া হারাধন তো এখন আর শুধু কোন ছাগল নয় ও তো তোমাদের বাড়ির এক সদস্য।'' এমন সময় মন্দিরে ঢাক ও কাঁসরের তীব্র আওয়াজ, ভক্তদের জয়ধ্বনিতে হারাধনের অন্তিম আর্তনাদ মিলেমিশে এক হয়ে গেল, - সব শেষ হয়ে গেল। পাখির পরম আদরের অবলা হারধনের প্রাণ নৃশংসভাবে হরণ করে নিল একদল ধর্মোন্মত্ত মানুষ। মহিতোষদার চোখের কোণায় জল চিক্ চিক্ করছে, কিন্তু মুখে আস্ফালন দেখিয়ে বলল, ''খবর্দার অনাদি, অমন কথা আর বলবে না। হারাধন ছাগলই ও কখনো মানুষ পরিবারের সদস্য হতে পারে না।'' মহিতোষদাকে জানিয়ে দিলাম হারাধনকে হারিয়ে ঐ বাসায় আমার পক্ষে আর থাকা সম্ভব নয়। আমি পাখিকে দেওয়া কথা রাখতে পারি নি, ওর হারাধনকে রক্ষা করতে পারিনি, আমি ওর মুখোমুখি হতে পারবো না। মহিতোষদা তখনো বিড় বিড় করে বলে যাচ্ছে,

''ছাগল কি মানুষ পরিবারের সদস্য হতে পারে? অসম্ভব, কখনোই এটা হতে পারে না, না না।" মহাবীর দূর থেকে ডাক দেয়, '' ও অনাদি স্যার, শান্তিজল নিয়ে যান।" আমি যন্ত্রের মতো ভিড়ের মধ্য দিয়ে মন্দিরের দিকে এগিয়ে গেলাম। মন্দিরে মূর্তির দিকে তাকিয়ে আমার সারা শরীর আসাড় হয়ে গেল। কালি মূর্তির পায়ের কাছে হারাধনের ধড়হীন মুন্ডু বিস্ফারিত চোখ নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে নীরব অভিযোগ জানিয়ে যাচ্ছে। দুচোখের কোণ থেকে তখনো রক্তের ফোঁটা চুঁইয়ে পড়ছে। শান্তিজলের নিকুচি করেছে, অশান্ত হৃদয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে পেছন ফিরে দৌড় দিলাম। সেদিন রাতটা আমি আমাদের কলিগ সন্দীপের বাসায় কাটালাম। অসহ্য যন্ত্রনায় বিছানায় সারারাত শুধু এপাশ ওপাশ করেছি, একটুও ঘুমোতে পারিনি, সামনে বার বার ভেসে উঠেছে হারাধনের জোড়া চোখ। পাখাঞ্জোরে আর একটা দিনও আমার পক্ষে কাটানো সম্ভব নয়। পরদিন সকালে কোম্পানির অফিসে রেজিগনেশান দিয়ে আবার শুরু হল আমার ভবঘুরে জীবন। সেই থেকে হারাধনের নীরব চোখ আমায় তাড়া করে বেড়াচ্ছে। দীর্ঘদিন ভুলেই ছিলাম, কাল রাতে খাবার টেবিলে প্রদ্যোতের কাছে 'কচি কালো পাঁঠা' কথাটা শুনে মনের মাঝে আবার ভেসে উঠল হারাধনের রক্তঝরা চোখগুলো। তাতেই যত বিপত্তি, সারা রাত ধরে তোদের সবার খাওয়া, ঘুম সব নষ্ট হয়েছে।

অনাদিদা থাকতে না পেরে সঞ্চারী বলল, ''পাখি'র আর কোন খবর পাননি" অনাদিদা বলল, ''অনেক বছর আগে সন্দীপের সঙ্গে একবার রায়পুরে দেখা হয়েছিল, ওর কাছেই মহিতোষদাদের কিছু খবর পেলাম। শুনলাম ঐ ঘটনার পর পাড়ি ফিরে পাখি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। দীর্ঘদিন মনরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হয়েছিল। পরে মহিতোষদারা সবাই পাখাঞ্জোর ছেড়ে কোথায় যেন চলে গেছে। পাখি এখন আমায় কি চোখে দেখে জানি না, তবে একটা অপরাধবোধ আমায় সব সময় তাড়া করে বেড়াচ্ছে, সেদিন কি চেষ্টা করলে আমি হারাধনকে বাঁচাতে পারতাম না!" অনাদিদার গল্প শুনে আমাদের সবার কথা হারিয়ে গেছে। সঞ্চারী কয়েক মিনিট নির্বাক হয়ে বসে থাকার পর ''তোমাদের জন্য চা নিয়ে আসি," বলে চোখের জল আড়াল করে দ্রুত রান্না ঘরে চলে গেল।

পালাবার পথ নেই

সমৃদ্ধ চ্যাটার্জী (H3/B/12/23)

''এই তকাই ! দরজাটা একটু খুলে দেনা, কেউ এসেছে''- মা চেঁচালো বাথরুম থেকে। আমি ঘুম থেকে উঠে একটু আলিস্যি ভেঙে নিয়ে উঠলাম দরজা খুলতে। দরজাটা খুলে দেখলাম যে কেউ নেই শুধুমাত্র একটা কাগজ, যেটাতে কিছু লেখা আছে। আমি তুলে নিয়ে যা পড়লাম সেটাতে গা শিউরে উঠলো। লেখা ছিল - ''মরতে আর তিনদিন, পালাবার রাস্তা নেই। ''আমি ছুটে গিয়ে মাকে দেখালাম, বললাম- ''মা, এটা দরজায় পড়েছিল, কিন্তু কোনো লোক ছিল না''। মা বললো, ''তোর বন্ধুরা এমনি মজা করছে বোধহয়। যা, স্কুলের জন্য তৈরী হয়ে নে।'' আমার মনে পড়লো যে স্কুলের সময় হয়ে গেছে। বাবার কাছে গিয়ে কাগজটা দেখিয়ে বললাম, ''বাবা ! এটা দরজায় পেলাম, কিন্তু কোনো লোক ছিল না। তোমার কি মনে হয়ে যে বন্ধুরা এমনি মজা করেছে ?'' বাবা বললো, ''হ্যাঁ, তাই হবে। চল, স্কুলের জামা কাপড় নিয়ে আয়ে। ''তখন বাজে সাড়ে সাতটা, স্কুলে পৌঁছতে হবে আটটার মধ্যে। হাতে বেশি সময় নেই, তাই তাড়াতাড়ি জামাকাপড় পরে, খাবার খেয়ে স্কুলে চলে গেলাম। স্কুলে তেমন কিছুই হয়নি। বাড়ি ফিরে, খেয়েদেয়ে দুপুরবেলা ঘুমোতে গিয়ে দেখলাম যে ঘুম আসছে না। বারে বারে সেই কাগজের লেখা কথাগুলো মাথায় চলে আসছে। জোর করে অন্য জিনিসের কথা ভেবেও ঘুম এলো না। সন্ধ্যা বেলাতেও পড়াশোনায় মন বসছিলো না। বারে বারে কাগজের লেখাটা চোখের সামনে ভেসে উঠছে। কোনো ভাবে পড়া শেষ করে ভাত খেতে বসলাম। খেয়ে উঠে দাঁত মেজে শুতে গেলাম। কিন্তু শুয়ে দেখলাম একটুও ঘুম আসছেনা। অনেক চেষ্টা করলাম ঘুমোবার, কিন্তু ঘুমোতে পারলাম না। ভাবলাম অনেক হয়েছে, এইরকম বেকার চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই। বাবাকে গিয়ে বলি। বাবাকে একটু নাড়া দিলাম। বাবা জেগে উঠে বললো, ''কি হয়েছে ?'' আমি বললাম, ''অনেকক্ষণ ধরে চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছি, কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসছে না, খালি ওই কাগজটার কথা মাথায় চলে আসছে।'' বাবা বললো, ''ওইটার কথা আর ভাবিস না, কোথাকার কোন কাগজের টুকরো, ওটা মাথা থেকে বের করে দে।'' তারই চেষ্টা করলাম কিন্তু তবুও মাথায় চিন্তা ঘুরপাক খেতে লাগলো, ''তবে আজই কি আমার শেষ দিন ? কাল কি সত্যিই আমি খুন হবো ?'' নিজেকে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করছি যে এইতো নিশ্চয়ই বন্ধুরা ভয় দেখানোর জন্য লিখেছে, কিন্তু কেন জানিনা আমার মনে মনে সেটা বিশ্বাস হচ্ছে না। শেষে এইসব ভাবতে ভাবতে আমার চোখ ঢুলে এলো আর আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। তখন বোধহয় ভোর চারটে কি পাঁচটা হবে। সকালবেলায় উঠে জলখাবার খেয়ে পড়তে বসলাম। আজ ছুটির দিন, পড়ায় মন বসলো না, তবুও পড়া শেষ করে বেলায় চান করতে যাবো, তখনি আবার কলিংবেল বাজলো। কাজের লোক ভেবে দরজা খুলে দেখি আবারো কেউ নেই, শুধু পড়ে আছে আগেরদিনের মতো আরেকটা কাগজ। কাঁপা কাঁপা হাতে কাগজটা তুলে দেখি যে লেখা আছে, ''মরতে প্রস্তুত হও !''

সেই দুপুরে বিন্দুমাত্র ঘুম এলো না। সন্ধ্যাবেলায় পড়াশোনায়ও একটুও মন বসছিলো না, তাই

মা একটু ব্রেক দিলো। পরের কাগজটা আর বাবা মা কে দেখায়নি। আবার চারটে ফালতু কথা শোনাবে। রাতের খাবার খেয়ে ঘুমোতে গেলাম, কিন্তু আমিতো নিশ্চিত যে একটুও ঘুম আসবে না। অনেকক্ষণ চিন্তা করে ভাবলাম যে বাড়ি থেকে যদি বেরিয়ে পড়তে পারি, তবে হয়তো খুনি আমায় আর খুঁজে পারবে না।

পা টিপে টিপে বাইরের ঘরে গিয়ে জ্যাকেটা পরে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম। আমাদের বাড়ির সামনের রাস্তাটা দিয়ে বেশি গাড়ি যায়না, তাই নিশ্চিন্তে হেঁটে চললাম। দুতিন মিনিট ধরে হাঁটার পর দেখলাম যে আমার পিছনে একটা লোক, তার মাথাটা হুডি দিয়ে ঢাকা, তাই মুখটা দেখা যাচ্ছে না, হাতে গ্লাভস এবং পায়ে জুতোমোজা পরা। সে দ্রুতবেগে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। ভয়ে আমার বুকটা ধড়ফড় করে উঠলো। আমিও যথাসম্ভব জোরে হাটতে লাগালাম। পিছনে তাকাতেই দেখলাম যে লোকটা দৌড়ানো শুরু করেছে। আমিও কিছু ভেবে না পেয়ে ছুটতে শুরু করলাম। ভয়ে মনটা অন্য দিকে থাকায়, একটা বড় পাথরের গায়ে হোঁচট খেয়ে, মুখ থুবড়ে রাস্তায় পড়লাম। পিছন থেকে হটাৎ একটা গম্ভীর অমানবিক গলা বলে উঠলো, ''পালবার রাস্তা নেই, মনে আছে তো বাপু!''

আমি বুঝতে পারলাম যে এই লোকটাই দরজার সামনে ওই গুলো রেখে গেছিলো। তার বুকের কাছে একটা নামের ট্যাগ ছিল আর তাতে লেখা ছিল ''জন এম.ব্রাডলি''। ''লোকটা ট্যাগ পরে এসেছে কেন?'' আমি ভাবলাম। তারপরই লোকটা নিজের মাথার হুডটি খুলে ফেললো আর আমি দেখতে পেলাম যে লোকটার মুখের জায়গায় একটা আস্ত মানুষের খুলি। সেটা দেখে আমি জ্ঞান হারাই।

আমার জ্ঞান ফিরলো সকাল বেলা। দেখলাম আমি আমার ঘরে শুয়ে আছি আর মা আমার মুখে জলের ছিটে দিচ্ছে। ''কি হয়েছে আমার''? জিজ্ঞেস করলাম। ''তুমি অজ্ঞান হয়ে রাস্তায় পড়ে ছিলে'', বললো মা। ''আমি বেঁচে আছি কি করে?'' আমি বললাম। ''আমাদের পাড়ার একজন ভদ্রলোক তোমাকে আর একজন হুডি পরা লোককে দেখতে পায়। ওনাকে দেখেই ওই হুড পরা লোকটি অদৃশ্য হয়ে যায়। তারপর উনিই তোমাকে এখানে নিয়ে আসেন'', বললো মা। আমি বুঝতে পারলাম যে আমি মরতে মরতে বেছে গেছি। আমার সব ঘটনা মনে পড়ে গেলো আর হটাৎ মাথায় এলো লোকটার নামটা। ''জন এম ব্রাডলি কে?'', আমি জিজ্ঞেস করলাম। ''সে তো একজন মস্তবড়ো সিরিয়াল কিলার'', বললো বাবা। ''ওই হুডি পরা লোকটার নেমট্যাগে ওই নামটাই লেখা ছিল'', আমি বললাম।

বাবা আশ্চর্য গলায় বললে, ''কিন্তু ওই লোকটি তো ১৯৯৫ সালে ধরা পড়ে গেছিলো আর তারপর তাকে ফাঁসি দিয়ে দেওয়া হয়েছিল''।

পদ্যাবলী

প্রদীপ মুখোপাধ্যায় (Y/8/15)

(১)

বৃষ্টি হলেই জলে যায় লেকভিউতে সমস্যা!
লেকভিউর মেম্বারদের শুরু হল ভাবতে বসা।
টোটোগুলো বন্ধ আগেই রিক্সা দু-এক চলছে কেবল
কথাকলির মাঝ বরাবর দেখতে পাচ্ছি এক হাঁটু জল।
অনেক ভেবে সেক্রেটারি বর্মাদেশে দিলেন অর্ডার,
খান পাঁচ সাত ডিঙ্গি নৌকা চলে এলো পেরিয়ে বর্ডার।

(২)

কলকাতার ট্রাফিক পুলিশ ময়দানেতে মিটিং ক'রে
শপথ নিল পাতবে না হাত টেম্পো লরি ধরে ধরে।
সবাই তাদের 'সাবাস' দিল, বাড়বে এতে দেশের মান,
হপ্তা দুয়েক বেশ চললো, যেই পকেটে পড়ল টান।
পুলিশগুলো সরকারকে বললে বাড়াও মোদের ভাতা
তা না হলে বাধ্য হয়েই হাত না পেতে পাতবো হাতা।

(৩)

ইউনিট টেস্টে কি করেছিস তুই!
অংকেতে পেয়েছিস দশে শুধু দুই?
কি করি বলো তো বাবা, স্কুল থেকে ফিরে
সপ্তাহে পাঁচ দিনই যাই সাঁতারে।
বাড়ি ফিরে শুরু হয় ড্রয়িংয়ের ক্লাস
যদিও বয়স মোর সবে সিক্স প্লাস।

(৪)

বড়ি থেকে বেরোলেই দেখি পথে ঘাটে
হাফ প্যান্ট পরে সব যুবা বুড়ো হাঁটে।
তরুণেরা পরে সব থ্রি- কোয়ার্টার
কলিকালে মতিগতি সব বোঝা ভার!
ফুলপ্যান্ট পরে শিশু আর কিশোরেরা
উল্ট পুরান দেখে আমি দিশাহারা।

With Best Compliments From

SANTOSH SHARMA

With Best Compliments From

SOUTH ASIAN ELEVATOR

With Best Compliments From

Adyama Complex Pvt. Ltd.

With Best Compliments From

M/S. JOYGURU ELECTRIC

With Best Compliments From

Samrat Roychowdhury

With Best Compliments From

Reliable Steels

With Best Compliments From

SAJJAN KUMAR SHARMA

খগেশ্বর

অরিন্দম তেওয়ারী (Y/11/22)

‘‘আচ্ছা, খগেশ্বর মানে কি?’’ লুচি তরকারির উপর নির্দয় আক্রমণ শানাতে শানাতে অ-মাইক ইন্দ্রাণীর প্রশ্ন।

-‘‘তা, এই ধর ‘খ’ হল গিয়ে ‘আকাশ’, ‘গ’ অর্থে ‘গমন করা’ অর্থাৎ, ‘খগ’ মানে আকাশ পথে গমন করে যারা অর্থাৎ ‘‘পাখি’’। সুতরাং খগেশ্বর হল ‘‘তাদের’’ মানে ‘‘পাখি’’দের ঈশ্বর, অর্থাৎ ‘গরুড়’ আর কি। তবে খগেশ্বর শিবও হয় বটে।’’, জ্ঞানের ঝাঁপি খুলে বসি নিজের।

-‘‘অরিন্দম তো জানবেই, গত দুদিন ধরে তো ওই খগবাহন হয়েই ঘুরছে কিনা’’, ফুট কাটলো আমার ‘‘শ্রেষ্ঠাংশ’’ইয়ে মানে বেটারহাফ, চৈতালি।

তা মন্দ কিছু বলেনি। গপ্পোটা বরং গোড়ার থেকেই বলি। এবছর লটারিতে ভিতরকণিকার নাম উঠেছিল পুজো শেষে ঘুরে আসার জায়গা হিসেবে। সে নাকি ভারি চমৎকার জায়গা। সুন্দরবন ছাড়া ভারতের একমাত্র ম্যানগ্রোভ বন। সুন্দরী, গরাণ, গেঁওয়া গাছেদের শ্বাসমূল এখানেও ‘‘টুউউকি’’ বলে উঁকি দেয় জোয়ারের নোনা জল ছাড়িয়ে। হরিণের দল গোরুর মতো চরে, কুমিরেরা হাই তুলতে তুলতে কাদার উপর লুটোপুটি খায়, হায়নারা অকারণে হাসাহাসি করে সজারুদের সাথে, সশাবক বনশুয়োর ইভনিং শোয়ে ক্যাটওয়াক করে। কপাল মন্দ হলে পনের বিশ ফুটের পাইথন, কি কিং কোবারাও চলে আসতে পারে আপনাকে স্যালুট ঠুকতে। মানে এককথায় ‘জাস্ট রোমহর্ষক’। থাকার ব্যবস্থাও হল ওড়িশা ফরেস্ট ডেভেলপমেন্ট কমিশনের নেচার ক্যাম্পে, যা বলতে গেলে বনদেবীর একেবারে কোলের কাছে।

গোল বাধলো যাবার ট্রেনের টিকিট নিয়ে। সেটা কনফার্ম নয় শেষদিন অবধিও। কুছ পরোয়া নেহি। ঠিক হল এক্সট্রিম কেসে জেনারেলের টিকিট কেটে উঠে পড়বো ট্রেনে, জয় মা বলে। যদিও এজেন্ট ভরসা দিচ্ছিল যে কিছু একটা হবেই। তো সেই ‘‘কিছু একটা’’ টা ঘটলো একেবারে নাটকীয় রকম শেষ মুহূর্তে। দশমীর ভাসান নাচ তুঙ্গে তখন। তারই ফাঁকে খবর এল ‘‘টিকিট কনফার্মড’’। তবে ভদ্রক যাবার ট্রেন গেছে বদলে! তাই যাবার সময়টাও এগিয়ে এসেছে এক ঘন্টা। রাত্তির এগারোটার বদলে রাত দশটায়।

সন্ধ্যে তখন প্রায় সাতটা। নেহাত ফেসবুক লাইভে ভাসান কভার করছিলাম তাই মেসেজটা চোখে পড়ে ছিল। নাহলে টিমের বাকি মেম্বাররা মানে আর্য, তার বউ ইন্দ্রাণী, তাদের ছেলে বুম, আমার বৌ সবাই যেরকম বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরণের নাচে নিজেদের ক্যাপাকাইটি দেখাচ্ছিল, দু দুটো বাঁ পা নিয়ে আমিও কি সে সুযোগ ছাড়তাম।

তারপর কেমন করে, সেই শব্দব্রহ্মের মধ্যে সবাইকে খবর পৌঁছে, নাচের পারফর্মেন্স মাঝ

রাস্তায় বাতিল করে, এক জায়গায় জড়ো হয়ে, ফ্রেশ হয়ে, ''রাত কা লাঞ্চ'' খেয়ে, গাড়ি যোগাড় করে, হাঁস-ফাঁস করতে করতে হাওড়া স্টেশনের একুশ নম্বর প্লাটফর্মে পৌঁছে, গাড়ী ধরে, ঘুমিয়ে এবং রাত তিনটেয় ঘুম থেকে উঠে ভদ্রক স্টেশনে নামলাম, সেটা অন্য গল্পের বিষয় হতে পারে। যেমনটি হতে পারে ভিতরকণিকা যাবার জন্য ভাড়া গাড়ির সংগে হওয়া মিসকমিউনিকেশন, গুগুল বৌদির ভুলভাল প্ররোচনায় রাস্তা হারিয়ে এক জন-মনিষ্যিহীন নদীর ঘাটে গিয়ে পোঁছানো, ফুটন্ত আলুর ঝোল দিয়ে ইডলি সহযোগে প্রাতরাশ সারা এবং অতঃপর প্রায় দেড়গুন ভাড়া কবুল করে গন্তব্যে পৌছানোটাও। সেইসব টপকে সরাসরি আমরা বরং গল্পের সেই কাল বিন্দুতে উপস্থিত হই যেখানে মঞ্চে প্রবেশ করবে-

-''আইজ্ঞা, আমার নাম খগেশ্বর জেইনা''।

-''আচ্ছা, খগেশ্বর জানা''।

-''জেইনা বটে বাবু, জেইনা''।

মাথা জোড়া ''জটায়ু'' মার্কা টাক, পাতলা লম্বাটে চেহারার খগেশ্বর, যা বুঝলাম নেচার ক্যাম্পের ''ম্যান ফ্রাইডে'। আমরা চেক ইনের নির্ধারিত সময়ের ঢের আগে পৌঁছে গেছি এটা মনে করিয়ে দিয়েও ফটাফট চিতল হাউসের দুইখানা ঘর একা হাতে সে সাফ করে ফেললো দেখতে দেখতে। সামনের দড়িতে শুকোতে দেয়া চাদর গুলো বাঁদরগুলোর হাত এড়িয়ে নিয়ে এসে পেতে দিল বিছানায়।এসি চালালে বাথরুমের দরজা যেন বন্ধ রাখি মনে করিয়ে দিল সে কথাও।

আর তার ফাঁকে আমরা হাতের ক্যামেরায় লাগানো ভীমের গদার মতো ১৫০-৬০০ লেন্সটা দেখেই সে বুঝে ফেলেছে যে পাখির সন্ধানেই আমার আগমন, সে যতই কেননা আমি হরিণ তাক করি। পাখি এখানে হরেক রকমের রয়েছে। পরিযায়ী এবং অধিবাসী মিলয়ে প্রায় আড়াইশো রকম। মাছরাঙাই আছে নয় নয় করে সাত ভ্যারাইটির। সংগে হরিণ, হর্নবিল, রবিন, ময়না, বি ইটার ইত্যাদি প্রভৃতি। সেই সাত কাহন দেবার ফাঁকেই অবশ্য বউদিরা জেনে ফেলেছে যে বোকা হরিণের দল রাতে জঙ্গলের সীমা ঠাউরাতে না পেরে চিতল হাউসের ব্যালকনিতেই উঠে আসে মোটামুটি। অবশ্য পুর্ণিমা রাতের কথা আলাদা। জ্যোৎস্নায় ধুয়ে যাওয়া আদিগন্ত চরাচরকে চমকে দেয় তখন গ্রে পেলিক্যানের চাঁছাছোলা আওয়াজ।হরিণেরা সেদিন, মানুষের কাছে ঘেঁষে না বড় একটা।

প্রথমে পাত্তা না দিলেও, কয়েক ঘন্টা যেতেই বুঝলাম খগেশ্বর মানুষটা পাখি পাগল-

''সে আপনারা যাবেন স্যার। গরমেন্টের নৌকা আছে। নদী থিকে ঘুরাই আইনবেক, আঠাইশ্শো টাকা... অই কল দিল, আউল, শুইনতে পেলেন''?

আমার তখন গুরু দ্রোণের সামনে যুধিষ্ঠির যথা অবস্থা। শুধু আউলের কল কেন, চিতলের ডাক, বাতাসের শব্দ, গাছের পাতার মর্মর ধ্বনি- কি না শুনতে পাচ্ছি।

-''ওই আবার আসেন আসেন। ডিএসএলআর 'ট নিয়ে অসেন"।

-''শোন শোন খগেশ্বর, সন্ধ্যে হয়ে গেছে। এই আলোতে আমার ক্যামেরায় উঠবে না ছবি।"

-''ক্যান উঠবেনি বাবু। এই টর্চের আলো দিব। ঠিক উঠবেক"।

সেও ছাড়ার পাত্র নয়। তিন ব্যাটারির টর্চের জোরালো আলোর লোভ দেখিয়ে আমাকে পিছনে বেঁধে আউলের কল লক্ষ্য করে গাছ থেকে গাছান্তরে চললো তার অভিযান। শেষ মেস দেখা মিললো জোড়া আউলের, টর্চও জ্বললো। কিন্তু আনাড়ি ক্যামেরা ম্যান ছবি তুলতে ফুলটু ফেল। যা উঠলো সেটা প্যাঁচাও হতে পারে আবার রুমালও হতে পারে। দুঃখ খগেশ্বরেরই বেশি। ডি এস এলআরের এমন চরম ধোঁকাবাজি তার ভাবনার অতীত। নেহাৎ দায়ে পড়ে রাতটুকুর মত সে ছাড় দিল এই অবোধ শহুরে বাবুকে। পরের দুদিন অবশ্য মন খুলে ছবি তুলিয়েছিল খগেশ্বর। ভোর না হতেই আমাকে ট্যাঁকে গুঁজে এমন কি আগের রাতের প্যাঁচা আর প্যাঁচানিকেও খুঁজে বের করেছিল। শুনিয়েছিল নানান পাখির নাম আর তাদের বিবিধ অভ্যেসের কথা। আমি আমার ''খারাপ ছাত্র" সুনাম বজায় রেখে সেসব বেমালুম ভুলে মেরে দিয়েছি। আপনারা জানতে চাইলে একবার ঘুরে আসুন না ভিতরকণিকা নেচার ক্যাম্প দঙ্গমল থেকে।

আপনার লাগেজ টোটোয় করে কটেজ অবধি পৌঁচে দিতে ক্যাম্পের গেটেই হয়তো হাজির থাকতে পারে খগেশ্বর।

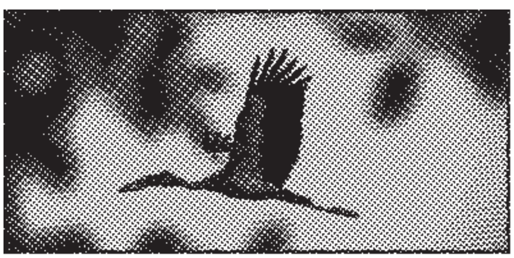
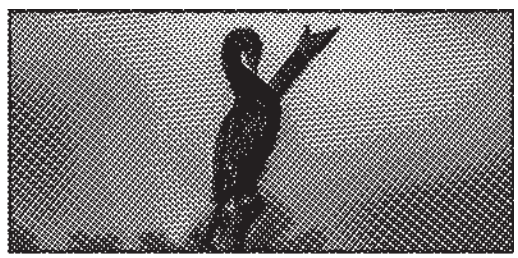
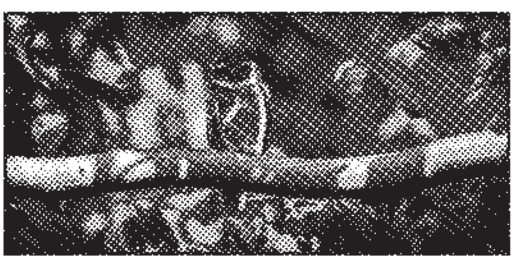
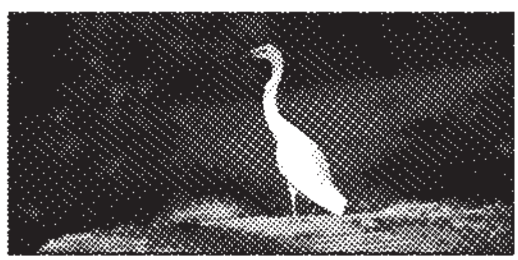
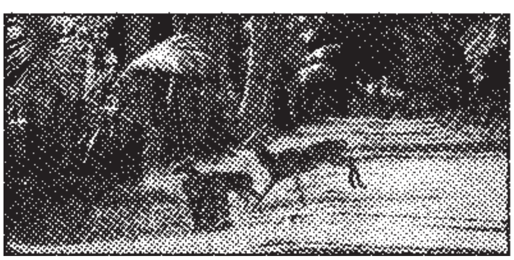
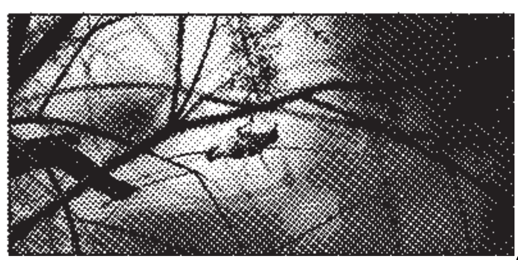

The Murder of Lokka

Arya Chatterjee (C/H3/11/1)

The whole team of Bat-tala experienced mental break-down after the members had gathered together to decide to kill a mad dog. Everyone had a sleepless night. The decision was not easy and didn't come easy, though. It had to travel a long discourse to reach this verdict.

Among the six juries the most garrulous was Sambhu. Sambhu was a little childish in his ways, though he was the oldest one among the six friends who were all indispensable to one another despite many differences from perspectives of social belonging to taste, and of course finance. At Sambhu's back, everyone discussed in the locality that due to his too candid nature, the least intent to apply diplomacy and perpetual innocence, he could not make his life the way it should have been.

Naturally during the discussion on what to do with the dog, Sambhu put it in the simplest of manner, straight away.

- Kill him. There is no other choice.

Keshto remarked, with an expression of outraged anger turned into apt replication and mimicry,

- Kill him….Is it that easy dude?
- Why not? Don't pretend to be a saint.
- What… why?

Raghu tried to soothe Sambhu,

- Well, even if we ARE going to kill him, and what is to there with a 'saint'?
- Don't just budge and don't let me open my mouth to all.
- Why what has Keshto done?

Asked Tulu

- No, I need not tell here, because you won't believe me.

Nadu said,

- Tell us, Sam, I'll treat you to a Gold Flake king size.
- No, I am ok with my bidis. And you are a lier. Last time you made me steal the ripe mangoes from the Mukhujje House and never treated the biriyani you had promised me.

Kamal remarked,

- Well, let it go Samu, I'll keep his promise this time for him…Just tell us what has Keshto done?

With the gradual and steady swells of Sambhu's eyeballs everyone straightened their spines to

welcome the blows through Kesho's story from Sambhu. Everyone knew it would be less to remark on them as 'arch rivals'. Keshto was smiling at the situation, as if he had done nothing and all his friends would be enthralled to hear an exaggerated and a twisted version of the truth from Sambhu, on whatever he spoke forth. Everyone knew, save Sambhu that another piece of pure was going to be created.

Good creations always need inspirations. The best poker in the team was Kanto. He was very good to catch the right moment to prick the balloon. So he invariably added,

- C'mon Samu, tell us, else your fat belly would puff larger with vaults of secrets of people in it. Well lemme guess…Has Keshto kissed Pompa?

Kanto had mastered the art to scrape the truth out from the most stubborn man on earth who is not ready to speak with his edge of slicing a conversation with blatant lies, apparently inadvertent and wild guess to entrap that very man to blow out the naked truth straight.

- All bull shit. What is kissing to do with killing a dog!!!
- No, I was just thinking that a lover has the guts to anything because everything is fair in love and war.

This really was the switch to allow the flow of the sludge in a gush from Sambhu.

- Last day he had been to Maluapara.
- So what…anyone can go there.
- …let me finish it…
- Who is stopping you?
- You….
- Well don't lie about him. He has done nothing. Anyone has the liberty to visit Maluapara and we all have some friends there too.
- Done nothing!!!! He had beef kebab with paratha. And you say that he has 'done nothing'!!! Just think that a Hindu is having beef. What would his ancestors think of him?
- What!!! Keshtooooo!!! YOU had BEEF!!!! Shame on you, Keshto!!! We should disown you as friends. Even your ancestors shall do the same. You have forced them to with such basic violation.

Kanto delivered this with all the possible nuances possible in the climax of jatra. After taking a deep breath, suddenly he again poked Sambhu,

- Sam are we not going to tell Shyamal Kaku (Keshto's father) about that?

Kanto tried to raise the effect of the situation with his exceptionally melodramatic expression, again. Everyone laughed. This was crude humour and out of the way. However, Sambhu maintained a seriousness and added,

- We should. And now see, he is hesitating to kill just a mad street dog!!! He bloody has eaten the flesh of a whole ox and now being sentimental unnecessarily. Don't you kill mosquitos? Don't you kill hens and cocks? Don't you kill fishes? Don't you kill rats and mice and…
- Shut up, else I'll kill you, now.

said Keshto with frozen and sharp voice that was devoid of any sort of light air. When Keshto used to take a serious stand on anything he was quite good in making the other people around understand that with his abrupt change in the inflection.

Now the fact that the dog needs to be disposed of somehow is not liked by Keshto and everyone else, but Sambhu. Everyone expected that even Sambhu would understand in time when he gets the real reason behind it.

Keshto always maintained since his childhood a different equation of relationship with all the local street dogs. He used to feed them all, daily, made a shade for them to rest, collected clothes for them in the winter. And among all the dogs Lokka was his most favourite one. Until a month ago, Lokka was quite like Snowy to Tintin.

So, it was not an easy task to kill Lokka. They had to wrench their hearts out to plan for Lokka's brutal murder. Everyone was concerned to take care of Lokka when he would be dying.
Keshto said,
- He should not suffer much of pain when he would be killed.
Everyone agreed that pain is inevitable while dying but it should not be sustainable one so that he suffers long just to die.
All started to think of the ways to get rid of Lokka, the most adorable street dog in the locality suddenly turned violent and biting people indiscriminately. Lokka's crime record in the last fortnight had reached two deaths from hydrophobia, five
bite injuries and two motor bike accidents. The injured ones are all bed ridden and struggling to get back to their normal lives.
One of the bikers badly injured by Lokka's guerrilla-style attack from the right side, recollected after he got back his full sense thankfully. It could have been worse because the accident had caused him injury on his back-head resulting into senselessness and vomiting. Now that the news of his getting back to senses all the friends in good spirit. They all went to see the victim in the district hospital. His name was Pratap Maji. He described the incident in verbatim:
- I could hardly control myself and my bike when the dog had attacked me from my right. I pulled my legs up so that it would not be able to reach me to bite me and losing my balance and control bumped straight into the deep open drain to my left. I don't remember anything after that.
This is what the twenty-six-year-old boy from the neighbouring locality said. He added that he had a family where his widowed elder sister with his two year only female child is dependent on him as after her husband's death the lady had been driven away by her in-laws. He and his motorbike are the only resources to do something, earn the livelihood and live on. The Motorbike also has suffered heavy injuries, which have the possibility to be healed up by the insurance company.
Such stories are common, very common with twisting drifts in the basic storyline of 'fight to survive' and the different routes they take still make us wonder that "how is that possible".
And still, even with the recent advent of the Artificial Intelligence, life remains the same with the bottom-line that "Truth is even stranger than fiction."
The young man's confession changed something in Keshto. It can be felt but cannot be explained. Suddenly, he, who takes life as what it comes, started talking about the deeper things in life,with high philosoplical edges awaiting relative interpretations.
So when it was concluded that Lokka was to be killed shortly, what Keshto said was,
- Only human beings have souls to be recycled into life and what about the dogs?
Sambhu asked,
- Why?
- Because it cannot come back as an apparition to avenge his murder.
Kanto was scared to find Keshto in such a condition.
- Bhai, are you alright? Please, do not be upset, everything will be fine.
- Yes it should be. People lose their children and still live. You know Kanto what is the most terrible thing in life?
- What?
- To see one's children, suffer.
- It is life. What to do?
- When the child is a human one, has to endure it. But in the world of the animals, the weak ones, and the diseased ones have only one choice.
- What is it?

- To die. Their parents themselves kill the weaker ones.
- What do you wanna say, man!
- Nothing.
The next morning the friends were all together, like every other day. Keshto was feeding the dogs a little far away and fondling their manes. Lokka appeared from nowhere. Seeing Lokka, we all secured ourselves so that he could not attack us. Keshto pretended that as if he had not seen Lokka and kept on cuddling the other dogs. Lokka, with much of jealousy could not stand it, and went near Keshto to have the best share of Keshto's care. Keshto ardently took Lokka from the litter of matured dogs behaving like pups. Keshto always carried a solid log of wood used as a door bolt in old days while feeding the dogs. Lokka was eating form Keshto's own hands and as he was rubbing Lokka's neck with the other hand, all could see from a distance that Keshto was nodding his head and talking to himself and the dog both. Lokka was cooing with such love from Keshto as the later continued feeding and rubbing him on his shoulders and along his neck. The log of wood was lying beside the right hand of Keshto.
In a flash of a moment Keshto picked the log up, one sudden heavy blow right in the middle of Lokka's head, out of nowhere. The dog was dead in an instance. The log
hit hard Lokka as he was being fed by Keshto, like a thunder. It ripped Lokka's brain apart with inside out. The sight was unbearable and beyond any description. We all shut our eyes with such unexpected fatal and gory strike. The dog instantly died with no chance to cry even.
Keshto waved his murder weapon from a distance to us, and shouted as a fallen hero
- This is what is called painless death…painless death. Yah!!!….Painless…absolutely painless.
And for the first time in their lives the bosom friends saw their bravest friend Keshto break into crying.
They have all done many bad things together, learnt even worse things together. Through learning the darker sides of life, they found out what it takes to be good human beings, above all everything. They believed that a drunken person is the most truthful one. They believed that the prostitutes are the most honest human beings, by profession.
But this was new, altogether. Unexpectedly new and deeply moving. Through the death of just a mad street dog, they learnt for the first time, what 'life' is like, once more, with an added heavy layer.
They all rushed to Keshto. Lokka laid beside his drooping figure like a white stuffed dog on a scarlet carpet. Without a word all pulled him up from his fallen state. He was smudged in drops of blood. Silenly, they grabbed everyone tight in their arms, smelling of unwashed clothes and sweat. All cried together until it was dark. No word came off them.
Kanto managed a jute sack from his factory. Kamal managed a spade. Tulu and Nadu, in the middle of the night drove a tricycle van to bury the corpse of their beloved Lokka somewhere beside the train line. Keshto withdrew himself from everything. And Sambhu, in fear, never came out of his house for the next few days, until Keshto went to his home and sought his presence. He cam out and broke down into crying straight on Keshto's feet.
- Forgive me Keshto…It was my idea.
- Your idea was brilliant and we all did it seamlessly. Lokka did not suffer much. I did take good care of that, no?
Keshto's vision were diffused by the liquid that keeps our eyelids shutter up and down, popularly known as 'tears', as he was torn apart, from within.
With the news going viral that Lokka is no more, though not the way he was driven to escape from the earth , the entire neighbourhood was contended with a deep sigh of relief.

———

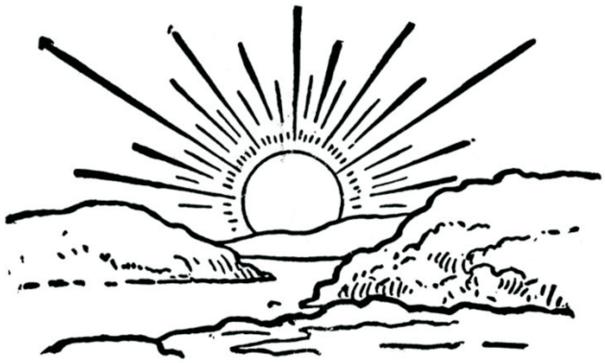

Among the Ancient Oaks

Shriya Ghosh **(Flat A/H5/3/6)**

Beneath the canopy's emerald glow,
A secret world begins to grow.
With its varied sorts of bushes and gorse,
It brings new life into prevalence.

The dew drops that lay on the foliage,
Coruscate in the light of the gleaming sun.
The winds hum songs through branches high,

A chorus soft as the morning sky.
Feathers gleam in hues untold,
Tales of skies, in whispers bold.
Messengers of hope, near and far,
Guided gently by the star.

Explore the world, far and near,
Its where we stay, our sweet sphere.

With Best Compliments From

HDFC BANK

We understand your world

Shibpur, Howrah Branch

With Best Compliments From

M.S. ELEVATOR (MONOJ GUPTA)

Reliable Bearig Company

K.D. STEEL CORPORATION

With Best Compliments From

CASTLE FITNESS GYM

With Best Compliments From

Rekon Elevator

With Best Compliments From

EK-ON-KAR GUEST HOUSE

415, Belilious Road, Howrah - 711 101
2nd Floor, Opp.- Punjab National Bank.
Near Howrah Maidan Metro
AC Rooms Available
Contact No.- 9830156237
9831143600

একটা অন্য রকম শীতের সকাল

আরাধ্যা সেন (A4/B/11/21)

ঠান্ডাটা আজ জমিয়ে পড়েছে, কুয়াশা ভরা সকালে জানালার কাঁচ গুলো ভিজে, বাইরেটা এখনও অস্পষ্ট। তাই ভালো করে কম্বলটা জড়িয়ে শীত ঘুমটা উপভোগ করতে বেশ ভালোই লাগছিল। হঠাৎ-ই বাথরুম থেকে মায়ের চিৎকারে ঘুম ভাঙতেই কলিং বেলের শব্দ শুনতে পেলাম। ছুটে গিয়ে ঘুম চোখে দরজা খুলতেই দেখলাম দাদু এসেছে প্রাতভ্রমণ সেরে। কিন্তু দাদুকে হাঁফাতে দেখে বললাম কি হয়েছে? বললো এই দেখনা পাপ্পিটা (আমাদের ছোট্ট আদরের কুকুর ছানা) হাত ছাড়িয়ে কোথায় যে পালালো, কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছিনা। পাপ্পিতো এরকম করেনা! বরং ওই দাদুকে পাহারা দেয়। একবারতো দাদু পড়ে যেতে, চিৎকার করে সারা বাড়ির ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছিল। তাই আমি আর দাদু মিলে পাপ্পিকে খুঁজতে নিচে নামলাম তড়িঘড়ি করে।

চারিদিকে খুঁজতে লাগলাম, দাদু কে বললাম তুমি বেঞ্চে বসে থাকো আমি দেখছি কোথায় গেলো, তাড়াহুড়োতে গরম জামা পরতে ভুলে গেছি তাই বেশ ঠান্ডা লাগছে। কাঁপতে কাঁপতে এদিক ওদিক খুঁজে বেড়াচ্ছি আর ডেকে যাচ্ছি, পাপ্পি এই পাপ্পি কইরে.... আয়..

শেষমেশ দেখলাম বাড়ির পিছনে গুদাম ঘরের পাশের ছোট্টো বাগানের মধ্যে ঢুকে বসে আছে, যেখানে নানা রকম রং বাহারি শীতের ফুল ফুটেছে। বাড়ির ওই দিকটা আমরা বড়ো একটা যাই না। দেখলাম গাঢ় নীল লাল হলুদ রঙের ফুলের মধ্যে আমাদের সাদা ধবধবে পাপ্পি যেন ফুলের সাজে সেজেছে। ও চুপটি করে বসে আছে। ডাকলেও কোনো সাড়া দিচ্ছে না। আর কোনো রামধনু রঙা প্রজাপতি যখন এক ফুল থেকে অন্য ফুলে উড়ে যাচ্ছে তখন ওকে তাড়া করছে কিন্তু ধরছে না। টকটকে লাল হলুদ ফড়িং এর সঙ্গেও একই ভাবে খেলছে। যেন আর কোনো দিকে কোনো ওর হুঁশ নেই। প্রকৃতি যেন খেলায় মেতেছে। সেকি মনোরম দৃশ্য যেনো চোখে লেগে থাকার মতো। কয়েক মুহুর্ত আমিও যেন কোথাও হারিয়ে গেছিলাম। তারপরেই দাদুকে ডাক দিলাম, 'দাদু এদিকে এসো পেয়েছি ওকে'। তারপর ডাকতে লাগলাম 'পাপ্পি' আয় চলে আয় আয় বলছি'...দাদু বলতে লাগলো আয় বাছা আয়..... কিন্তু ওর যেনো কোনো হুঁশই নেই। কিছুক্ষণ ডাকার পরে একটু রাগও হলো, দাদু বললো কি বদমাস হয়েছে দ্যাখ .... কিছুতেই কথা শুনছে না। এরপর ওর গলার চেন ধরে টান দিলাম... ও যেন প্রাণপণ চেষ্টা করছে পালানোর জন্য। আমিও জোরে জোরে টান মারতে থাকলাম আর চিৎকার করতে লাগলাম .... আয় বলছি আয়'।

হঠাৎই শুনলাম মায়ের চিৎকার ... আর সঙ্গে কিল চড়... ধড়মড়িয়ে উঠে বসে দেখি মায়ের বিনুনীটা আমার হাতে। মা বলছে, 'ছাড় বলছি ছাড়', হুঁশ হতে বুঝলাম ঘুমের ঘোরে স্বপ্নে মায়ের বিনুনী ধরে মেরেছি হেঁচকা টান, বোধহয় একটু জোরেই হবে ... দেখি মা মাথায় হাত বোলাচ্ছে।

জল খাবার টেবিলে সবার সেদিন হাসিতে হেঁচকি খেয়ে মরার মতো অবস্থা, আমার কান্ডটা আর আমার স্বপ্নের গল্প শুনে। আমিও মনে মনে হাসলেও, একটু লজ্জাও লাগছিল, তাই হাসি হাসি লাজুক মুখেই জলখাবারটা উপভোগ করলাম সেদিন।

মনের আঁধারে

চৈতালি তেওয়ারি (Y/11/22)

(স্টেজে স্পষ্ট অথচ মায়াবী এক আলো। লাল বা নীলচে।)

(স্টেজের সামনের দিকে একটি ডায়াল করা টেলিফোন আর এক কোনে একটা কালো বক্স রাখা। ষাটোর্ধ এক ভদ্রলোক বক্সটায় বসে। নাম সুধীর চৌধুরী। পরনে ঘরের পাজামা, পাঞ্জাবী। চোখে চশমা। হাতের পেপারটা পড়ছেন। ওনার থেকে একটু দূরে স্টেজে একটা ব্যাডমিন্টন র‍্যাকেট পরে আছে। ভদ্রলোকের বয়সী এক ভদ্র মহিলা এসে ঢোকেন। ওনার স্ত্রী, নাম কমলিকা, পরনে শাড়ি। ওনার হাতে ধরা একটি টিশার্ট ভাঁজ করতে থাকেন এবং গাইতে থাকেন.....)

কমিলিকা - আমার সোনা চাঁদের কনা ....

(ভদ্রলোক পেপার থেকে চোখ একটু নামিয়ে ওনাকে দেখতে থাকেন। কমলিকা হাতের গেঞ্জিটা ভাঁজ করে হাতেই ঝুলিয়ে রেখে মেঝে থেকে ঝুঁকে ব্যাট তুলতে তুলতে বলে ওঠেন)

কমলিকা - সোনাই, কবে যে তুই বড় হবি কে জানে? নিজের জিনিসগুলো তো একটু গুছিয়ে ঠিক করে রাখতে পারিস। জেনে গেছিস মা যখন আছে করেই দেবে। বেলা পরে এল এখনো বাড়ি ফিরলো না ছেলেটা। (বাইরের দিকে দেখতে থাকে) বারোটা বাজতে যায়। (সুধীরের প্রায় গা ঘেঁসে ব্যাটটা কে এমন করে রাখেন যেন ওনাকে দেখতেই পান না। হাতে ঝোলানো টি-শার্ট টাকে তুলে ধরে চুমু খায় আবার গানটা গাইতে গাইতে বেরিয়ে যান।)

(ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ান পেপারটা বক্সয়ের ওপর রাখেন। খুব চিন্তাগ্রস্ত মুখে সামনে রাখা ব্যাটটা তুলে বুকের কাছে নিয়ে এগিয়ে এসে টেলিফোনে ডায়াল করেন।)

সুধীর - নমস্কার, এটা কি সাইক্রিয়াটিস্ট অভয় মৈত্রের নাম্বার? নমস্কার ডাক্তারবাবু আমি সুধীর চৌধুরী বলছিলাম। My wife Kamalika Chowdhury is your patient. আমি কালকেও ফোন করেছিলাম। আমি জানি আপনি সব জানেন। আমাদের একমাত্র ছেলে সৌনক আপনারই Patient ছিল। বছর তিনেক আগে ডিপ্রেশনে চলে যায় এবং সুইসাইড করে। ছেলের এভাবে চলে যাওয়া কমলিকা কেন যে মেনে নিতে পারছে না। দিনে দিনে ওর সমস্যাটা বেড়েই যাচ্ছে। বুঝতে পারছি না কি করব। রোজ যেভাবে ছেলের উপস্থিতি ও অনুভব করে যেন সৌনক বেঁচে আছে। অদ্ভুত ভয় লাগছে ডাক্তারবাবু। আমি কি আপনার কাছে নিয়ে যাবো নাকি আপাতত ওর ডোজটা বাড়িয়ে দেব?

(সুধীর চোয়াল শক্ত করে শুনতে থাকেন ওদিক থেকে কেউ যেন কি বলছে। ততক্ষণে স্টেজের পিছনের দিকে ঢোকে বছর ত্রিশের একটি ছেলে। সৌনক। উসকো খুসকো চেহারা। পরেন Half Pant, T-ShirtV

সুধীর - (চোয়াল শক্ত করে বলে) রাগ করবেন না ডাক্তারবাবু। আমি কি আর ইচ্ছে করে আপনাকে রোজ ফোন করি। রাখছি। (বলে ফোনটা নামিয়ে রেখে ব্যাট টাকে সযত্নে আরেকবার আঁকড়ে ধরে স্টেজ থেকে বেরিয়ে যান।)

(ভদ্রলোক চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকেন ছেলেটি। এরপর বক্সের ওপর রাখা পেপারটা

তুলে নিয়ে যত্ন করে বুকের কাছে ধরে এগিয়ে এসে ফোনের রিসিভারটা তুলে ডায়াল করে।)

সৌনক - Is it Dr. Avay Maitra's Chamber? Dr. Maitra আমি সুধীর চৌধুরীর ছেলে সৌনক চৌধুরী। আমার মা কমলিকা চৌধুরী আপনারই Patient ছিলেন। একদম ঠিক। আমিই ফোন করি আপনাকে। মায়ের অ্যানারেক্সিয়ার ট্রিটমেন্ট আপনার কাছেই হত। খাওয়া দাওয়া সমস্ত বন্ধ করে দিয়েছিল মা। প্রথমে কম খেতো। তারপর অদ্ভুতভাবে একদম খেতেই পারত না। ৩ বছর আগে আমাদের ফ্যামিলিটা ছারখার হয়ে যায় মায়ের মৃত্যুতে। (এক হাত দিয়ে মাথাটা চেপে ধরে। পরক্ষণেই সামলে নেয়)

সৌনক - কিন্তু Doctor, আমি আগেও বলেছি বর্তমানে আমার সমস্যা বাবা। বাবা সব জায়গায় মাকে জীবিত দেখছেন। আমি সত্যিই বুঝতে পারছি না যে আমার কি করা উচিত। যদি একটা Appointment রাগ করবেন না ডাক্তারবাবু। আমার সমস্যাটা বোঝার চেষ্টা করুন।

(ছেলেটির রিসিভার নামানোর আগেই পেছনে দিকে ঢোকে কমলিকা। সৌনক হাতের পেপারটা নিয়ে স্টেজ থেকে বেরিয়ে যায়। কমলিকা তাকিয়ে থাকে ছেলের চলে যাওয়ার দিকে। কমলিকার হাতে সেই টি-শার্টটা রাখা। ওটাকে দেখতে থাকেন। এবং কোথাও একটু ভেঙ্গে পড়েন তারপর রিসিভার এর কাছে গিয়ে রিসিভারটি তুলে নেন, ডায়াল করেন।)

কমলিকা - (ঠান্ডা গলায়) ডক্টর অভয় মৈত্র বলছেন? আমি সুধীর চৌধুরীর Wife কমলিকা চৌধুরী বলছিলাম। আমার কথাটা একবার শুনুন। অ্যাঁ, কি বললেন? সুধীর আপনাকে ফোন করবে কি করে? (A cold suspense music)þ

সুধীরের আলজাইমারের Treatment তো আপনার কাছেই চলতো। কি বলছেন!!! আপনি তো সব জানতেন। সুধীর প্রায় দিন বাড়ি থেকে বেড়িয়ে যেত। আর কিছু মনেও করতে পারত না। শেষের দিন কীভাবে যে রেল লাইনের কাছে গিয়ে ঐরকম মর্মান্তিক ভাবে কাটা পড়লো...... (হাতেরট- Shirt দেখে ডুকরে কেঁদে ওঠে)।

কমলিকা - (orry, ডাক্তারবাবু। আমি যতই ভাবি না কেন যে মা-বাবা দুজনের স্নেহ দিয়ে ছেলেটাকে ভুলিয়ে রাখবো। ততই দিনে দিনে সব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে।

সৌনক যেন মানতেই চায় না যে His father is no more. (Same suspense music) বাবার ছোট ছোট জিনিসগুলো যত্ন করে আঁকড়ে থাকে। বাবার সাথে কথা বলে, গল্প করে। আমি কি করবো কিছু বুঝতে পারছি না। যদি আপনার একটা Appointment...... (মুখটা অদ্ভুত রহস্যময় করে ডায়াল নামিয়ে T-Shirt টা দেখে)

কমলিকা - (গান) আমার সোনা চাঁদের কনা (স্টেজ থেকে বেরিয়ে যান)

(একজন তরুণ ভদ্রলোক, ডঃ অভয় মৈত্র, হন্তদন্ত এবং উত্তেজিত ভাবে ঢোকেন। গায়ে ডাক্তারের এপ্রন, কানে মোবাইল ফোনে কারুর সাথে কথা বলছেন। চেহারা অত্যন্ত বিধ্বস্ত।)

অভয় - হ্যালো হ্যালো, ফোনটা রাখবেন না (ধমকিয়ে), আমি বলছি ফোনটা রাখবেন না (চীৎকার করে)। দিনের পর দিন আপনারা ফোন করে যাচ্ছেন, বাবা ফোন করে বলবে মাই সন ইজ

নো মোর, ছেলে ফোন করে বলতে মাই মাদার ইজ নো মোর, মা ফোন করে বলবে মাই হাজবেন্ড ইজ নো মোর। কি চান আপনারা। আপনাদের এই কনফিউশন তো এভাবে আমাকে পাগল করে দেবে।

(স্টেজে ঢোকে অভয়ের বয়সী অভয়ের স্ত্রী মায়া)

মায়া - (খুব উদ্বেগের সাথে) অভয় কি হয়েছে? আবার শরীর খারাপ লাগছে? কাদের সাথে কথা বলছো। দ্যাখো এখানে কেউ নেই।

অভয় - (চোখ মুখ অস্থির, কথায় রিপিটেশন) আমি তোমাকে কবে থেকে বলছি, রোজ চেম্বারে এই একটা অদ্ভুত ফ্যামিলির ফোন আসে। বারোটা, বারোটা বাজলেই। একটা Weird ফ্যামিলি। আমাকে পাগল করে দিচ্ছে। তাদের প্রত্যেকের আমার কাছে এপয়েন্টমেন্ট চাই। তারা নাকি সবাই আমার Patient. ছেলের ডিপ্রেশন, বাবার অ্যালজাইমার, মার অ্যানারেক্সিয়া। আর তারা সবাই জানে তারা সবাই dead. আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না, কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। মাথার মধ্যে দিনরাত যেন হাজার মাকড়সা জাল বুনে যাচ্ছে। সেই ধোঁয়াটে আর নোংরা জালে আমি যেন চারিদিক থেকে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে যাচ্ছি। কেন? কেন এমন হচ্ছে মায়া?

(মায়া শান্তভাবে এগিয়ে এসে অভয়ের হাত থেকে মোবাইলটা নেয়)

মায়া - অভয় এই মোবাইলটার কোন সিমও নেই। আজকাল তুমি চেম্বারে যাও না। চেম্বারে বার বার এই পরিবারটার কথা বলে চেঁচামেচি করতে। তোমার বন্ধু ডক্টর বিনায়েক তোমাকে বিশ্রাম নিতে বলেছেন। সব ঠিক হয়ে যাবে অভয়, আমি আছি তো তোমার সাথে। এটা খেয়ে নাও। (ওষুধ আর জল দেয়। অভয় খেয়ে নেয়)

(মায়া অভয়ের হাতটা ধরে, অভয় অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে) (হঠাৎ অভয় উত্তেজিত হয়ে ওঠে)

অভয় - কি বলতে চাইছ তুমি, কি বলতে চাইছ? আমি বিখ্যাত সাইক্রিয়াটিস্ট অভয় মৈত্র। তুমি নিজেও একজন ডাক্তার। এই হ্যালুসিনেশন কি সুস্থ লোকের পক্ষে সম্ভব? আমি সব কিছু স্পষ্ট শুনতে পাই। আজকাল তো আমি ওদের ঘরের ছবিও পরিষ্কার দেখতে পাই। ওরা যে কি কষ্টে আছে। সুধীর চৌধুরী, কমলিকা চৌধুরী, সৌনক চৌধুরী। এদের প্রত্যেকের নাম ও আমার চেনা। আর তুমি বলছো এরা Just আমার কল্পনা। Everything is me. My own bloody mind. না না এ হতে পারে না। তুমি দেখো ওরা আবার ফোন করবে, আবার ফোন করবে। করবেই। মাথাটা কেমন যেন হচ্ছে, খুব ক্লান্ত লাগছে।

মায়া - তুমি গিয়ে রেস্ট নাও। সব ঠিক হয়ে যাবে। (অভয় বিড়বিড় করতে করতে বেরিয়ে যায়। মায়া মধ্যের স্টেজে এসে দাঁড়ায়।)

মায়া - (দর্শকের উদ্দেশ্যে) - কে বলে জীবিত অবস্থায় জীবন থেমে যায় না। অভয়, তুমিই বলতে তাই না? A poor mental health condition can stop your life when you are alive. (চোখের জল মোছে)

(মায়া মাথায় হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে, মিউজিক, মায়া বেড়িয়ে যায়। যেন কিছু সময় অতিক্রান্ত)

(ঢোকে সৌনক, মা ও বাবা)

সুধীর - আসতে পারি? (মায়া ঢোকে)

মায়া - আসুন, আপনাদেরই অপেক্ষায় ছিলাম। অভয় কে আজ মেন্টাল অ্যাসাইলামে নিয়ে গেছে জানেন হয়তো।

কমলিকা - জানি মা, কিন্তু কেন জানি না আজ যতটা খুশি হওয়ার কথা ছিল হতে পারছি না। ওর নীরার মত পরিণতি আমি চাইনি মা।

মায়া - ভাববেন না। ওর চেতনা ঘুমিয়ে ছিল, এবার জাগবে। নিজের কাজের এই টুকু মাশুল যে দিতেই হত।

সৌনক - জানেন থানা, পুলিশ কারুকে বলে বোঝাতে পারতাম না দিদি নিজেকে মারেনি। তাকে একটু একটু করে মানসিক যন্ত্রণায় রেখে, অবহেলা করে, অসুস্থ করে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে মাত্র। কাউকে বোঝাতে পারতাম না।

কমলিকা - মায়া, আমার কাছে একটা কাজও পরিষ্কার নয়। আমার মেয়ে নীরা অভয়ের প্রথম স্ত্রী ছিল। সে মানসিক রোগী এই গ্রাউন্ডে তাদের ডিভোর্স হয়ে যায়। বর্তমানে তুমি তার সহধর্মিনী। তাও আমার মেয়ের জীবনের দাম মেটাতে নিজের জীবন এভাবে শেষ করলে কেন? (কমলিকা কাঁদতে থাকে মায়া হাতটা এসে ধরে)

মায়া - কাকিমা এই শেষ বোঝাপড়াটা না হয় আমার আর অভয়ের ওপর ছেড়ে দিন।

(সুধীর এগিয়ে এসে কমলিকা কে ধরে) দুজন বেড়িয়ে যায়, সৌনক বেরিয়ে যেতে গিয়েও ঘুরে দাঁড়ায়)

সৌনক - আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি, আমাদেরকে যে নামগুলো নিয়ে ফোন করতে বলেছিলেন তার কি বিশেষ কোনো কারণ ছিল?

মায়া - কলগুলোর বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়াতে। এরা প্রত্যেকেই অভয়ের পুরনো পেসেন্ট। আনফরচুনেটলি এখন আর কেউ জীবিত নেই।

সৌনক - আর ঠিক বেলা বারোটায় ফোন করাটা ফোন করাটা?

মায়া - Psychiotic Shock!! রোজ একটা নির্দিষ্ট সময়ে ব্রেনকে হ্যামার করা। সেটারও দরকার ছিল। (সৌনক বেরিয়ে যেতে যায়)।

মায়া - দাঁড়াও, এটা নিয়ে যাও। রাস্তার কোথাও ডেসট্রয় করে দিও। অভয়ের ফোনের এই সিমটার আর কোন দরকার নেই।

সৌনক - আচ্ছা। (সৌনক বেরিয়ে যায়)

মায়া - (ফোন করে) বিনায়ক, অভয়ের সুস্থতার ভার আমি নেব। Put me as his consultant doctor.

(মায়া বেড়িয়ে যায়, স্টেজে অভয় ঢোকে ক্লান্ত হাঁটাচলা। হসপিটালের পোশাক স্টেজের মধ্যে এসে বসে।) মায়া প্রবেশ করে।

মায়া (স্টেজে ঢোকে। আস্তে ডাকে) - অভয়.....

অভয় - কে? মায়া এসেছো। তোমার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম এত সময় লাগলো কেন? এখানে আজকাল বড্ড অন্ধকার লাগে। আমার খুব ভয় হয় মায়া। একজন সাইক্রিয়াটিস্ট হিসেবে বুঝতে পারি যে পেশেন্ট পেসেন্ট অভয় মৈত্র আর তার অন্তিম পরিণতির মধ্যে কেবল একটা সরু সুতোর ব্যবধান মাত্র রয়ে গেছে। আজকাল একজনের কথা খুব মনে হয়, এই ঘরের চারপাশে আমি তাকে দেখি। আমি দেখি, রোজ দেখি।

মায়া - নীরা, তোমার স্ত্রী। তাইতো।

অভয় - তুমি নীরাকে চেনো?

মায়া - আমাদের পরিচয় তখন একটু একটু করে বাড়ছে। ডাক্তার অভয় মৈত্র, বিখ্যাত সাইক্রিয়াটিস্ট ডাঃ অভয় মৈত্র, নিজে এত বড় একজন ডাক্তার অথচ বউ কে সারাতে অক্ষম। লোকজনের সেকি সহানুভূতি। এমনকি আমারও। আমাদের বিয়ের পর ওই বাড়িতে আমি নীরার কোন ছবি দেখিনি। ওর থাকার কোনো চিহ্ন ও পাইনি। তারপর একদিন টিভির নিউজে শুনলাম, গঙ্গায় নিজেকে শেষ করেছে, সে প্রাক্তন স্ত্রী of doctor Avay Maitra. টিভির পর্দার এক কোণে মেয়েটার ছবি দেখে চমকে যাই আমি। নীরা। নার্সারি থেকে ক্লাস টুয়েলভ অবধি একসাথে এক ক্লাস। হোমওয়ার্ক থেকে টিফিনবক্স। কিসের ভাগীদার ছিলাম না আমরা। ক্লাসের ছটফটে প্রানোচ্ছল একটা মেয়ে। একটা সময় পরে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। ভাবলাম হারিয়ে গেছে সময়ের ব্যস্ততায়। জেনেছিলাম ওর বিয়ে হয়েছে কোন এক ডাক্তারের সাথে।

মনে পড়তো, পুরনো বন্ধুকে অনেক সময় মনে পড়তো। কি এমন হয়েছিল যা এই হাসিখুশি মেয়েটাকে এই রাস্তা বেছে নিতে দিল। এ বাড়ি আনাচে কানাচে খুঁজতে লাগলাম নীরার অস্তিত্ব। অবশেষে চিলেকোঠায় বাড়ির ফেলে দেওয়া আবর্জনায় খুঁজে পেলাম এই ডাইরি। চিনতে পারো?

অভয় - (অবাক হয়ে) নীরার ডায়েরি।

মায়া - পাতায় পাতায় অবহেলা, পাতায় পাতায় একাকীত্ব, পাতায় পাতায় অপমান। একটা মানুষকে একা ছেড়ে দেওয়ার থেকে আর কষ্টের কি হতে পারে, কি হতে পারে অভয়? আর শুধু এখানেই থেমে যা-ও নি। বিখ্যাত সাইক্রিয়াটিস্ট অভয় মৈত্র এটা জানতেন, ঠিক কি ভাবে, কোন ভাবে মানুষের সুস্থ মস্তিষ্ক নিয়ে খেলা যায়। তাই দিনের পর দিন......একটা মানুষ হ্যালুসিনেট কখন করে অভয়, (চীৎকার করে) উত্তর দাও অভয়।

অভয় - (হকচকিয়ে) সাইকো অ্যাকটিভ ড্রাগ। হ্যালুসিনোজেন। আমি.....আমি মায়াকে রোজ দিতাম। থাইরয়েডের ওষুধ বলে। নিরা না গেলে মায়া আসবে কি করে। নিরাকে তো সরাতেই হতো। বোকা মেয়ে। ও না......ও আমাকে বড্ড বিশ্বাস করতো।

মায়া - ঠিক যেমন তুমি আমাকে বিশ্বাস করো তাইনা?

অভয় - মায়া!! (অভয় অবাক হয়ে তাকায়)

মায়া - শুধু নীরা আমার বন্ধু ছিল বলে নয় অভয়। নীরার জায়গায় যে কেউ হতো আমার লড়াই

টা একই হত। মানুষ কি দিয়ে তৈরি হয় অভয়? শুধু এই শরীরটা না? নাকি এটা ছাড়িয়েও আরও খানিকটা। বল!! আমাদের এই আমিটা আসলে কে? বল (চেঁচিয়ে)

অভয় - A bundle of my memories, my experiences, my feeling, thoughts, relationship, values.... (ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে)

মায়া - আর এই সমস্তটাকে যে নিয়ন্ত্রণ করে সে হলো আমাদের ব্রেন, মস্তিষ্ক। একদিন এ প্রশ্ন হয়তো তোমার থেকেই আসবে আমিও তো একজন ডাক্তার ছিলাম তাহলে আমার সাথে একই কাজ কি করে করলাম। এর চেয়ে তো অনেক সহজ ছিল তোমাকে ছেড়ে চলে যাওয়া। সেটা করলে তুমি বুঝতে পারতে না মাথার মধ্যে সত্যিই নোংরা মাকড়সা গুলো যখন ঘুরে বেড়ায় তখন তার যন্ত্রণা হাজার মৃত্যুর সমান হয়। আমি ডাক্তার তাই আমি জানি খাদের কিনারা থেকেও তোমাকে কিভাবে ফেরাতে হবে, কিন্তু নীরা একা ছিল তোমার ভরসা একা ছিল।

(অভয় ধিরে ধিরে ভেঙে পড়ে। মাটিতে বসে পড়ে)

মায়া - ডাক্তার হবার সময় নেওয়া Oth এতোই কি ঠুনকো ছিল?

মায়া - 1 in every 8 people are affected. It will be double soon.

অভয় - তাই কাছের মানুষগুলো সব ভুলে যাওয়ার আগে তাকে সব মনে করানোর দায়িত্ব নিতে হয়।

মায়া - ৮ million people dies every year.

অভয় - তারা দূরে সরে যাচ্ছে দেখতে পেলে তাদের সাথে মন খুলে কথা বলতে হয়।

মায়া - একেবারে অন্ধকারে তলিয়ে যাওয়ার আগে।

অভয় - (এগিয়ে এসে মায়ার হাতটা ধরে) হাতটা শক্ত করে ধরে বলতে জানতে হয়। There is hope and in with you.

(মায়া হাতটা ছাড়িয়ে নেয় অভয় মাটিতে পড়ে)

ফ্রিজ।

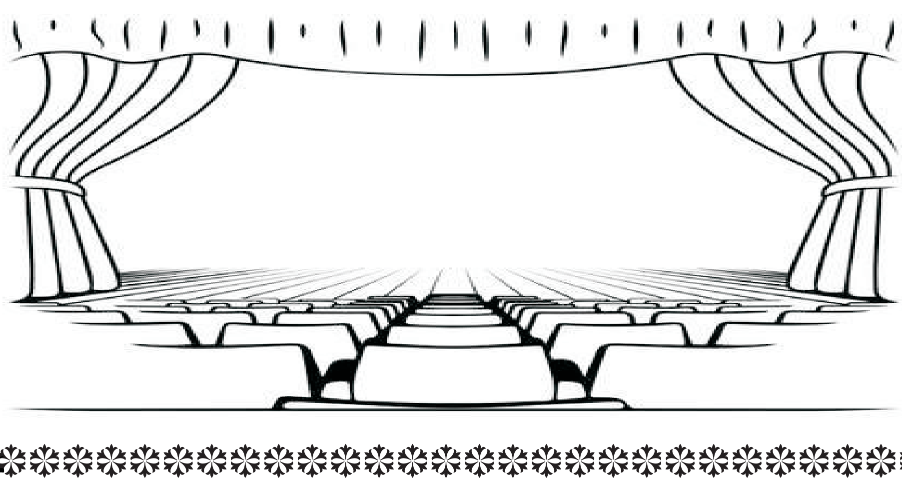

দাদুর আশীর্বাদ

মুকুল সরকার (B/H2/3/16)

তুতুলের খুব মন খারাপ। আগামীকাল ইন্টার স্কুল বিমল স্মৃতি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচ, কিন্তু হঠাৎ করেই ঠান্ডা লেগে সে খুব কাবু হয়ে পড়েছে এবং বিছানায় শয্যাশায়ী। তুতুলের ভালো নাম মৈনাক দাশগুপ্ত। সে সুকান্ত কলোনীর অবৈতনিক স্কুলের ক্লাস এইট এর ছাত্র। তুতুলের বাবা মনোজিৎ পাড়ারই অজয় কাকুর মুদি দোকানে সামান্য মাসোহারার বিনিময়ে কাজ করে। তুতুলের মত মেধাবী ছাত্রকে ভালো স্কুলের পড়ানোর ইচ্ছে থাকলেও পয়সার অভাবে সেটা হয়ে ওঠেনি। তুতুলের বর্তমান সময় খুব একটা ভালো যাচ্ছে না। ডাক্তার কাকু বলে দিয়েছেন এক সপ্তাহ আগে এই ভাইরাল ফিভার ঠিক হওয়ার নয়। ফাইনালে খেলা তো অসম্ভব ব্যাপার। এদিকে প্রতিপক্ষ চার্জার স্কুল গতবারের চ্যাম্পিয়ন এবং যথেষ্ট শক্তিশালী দল। ওদের দলের পাঁচজন খেলোয়াড় জেলাস্তরে খেলে। এদিকে কলোনীর স্কুল টিম যথেষ্টই আনকোরা এবং এত বড় মাপের টুর্নামেন্টের ফাইনালে এই প্রথমবার খেলবে। তুতুলের অনুপস্থিতি দলটিকে ব্যাটিংয়ের দিকে আরও দুর্বল করে দেবে। এদিকে পাড়ার অসীম দাদু যার হাত ধরে তুতুলের ক্রিকেট জগতে প্রবেশ, তিনি হঠাৎ করেই অসুস্থ হয়ে পরলোক গমন করেছেন। এই অবস্থায় তুতুল নিজেকে অভিভাবকহীন হিসেবে ভাবতে শুরু করেছে। নিজের আত্মপ্রত্যয় যেন তার থেকে সরে গেছে। অসীম দাদু অর্থাৎ অসীম চৌধুরী নিজের যুবক বয়সে একজন নামকরা ক্রিকেটার ছিলেন, তিনি রাজ্যস্তর পর্যন্তও খেলেছেন। তিনি কলোনির বাচ্চাদের কুঁড়ি অবস্থা থেকেই ক্রিকেটার বানানোর স্বপ্নে 'সংগ্রাম সংঘ' ক্রিকেট একাডেমি খুলেছিলেন। তুতুলের মতন অনেক গরীব ক্রিকেটারই এই সংঘের সঙ্গে শিক্ষানবিশ হিসেবে যুক্ত। তিনি তুতুলকে কথা দিয়েছিলেন যে ফাইনালে সে যদি ভালো খেলতে পারে তাহলে তার জন্য দারুন একটা উপহার অপেক্ষা করে রয়েছে। কিন্তু টুর্নামেন্ট চলাকালীন তাঁর প্রয়াণ তার প্রিয় ছাত্রের আশায় জল ঢেলে দিয়েছে। এদিকে, কলোনি স্কুলের দল গঠন নিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছে। এত স্বল্প সময়ে তুতুলের বদলি ব্যাটস্ম্যান পাওয়া খুবই দুষ্কর ব্যাপার। দরকার হলে একজন অতিরিক্ত বোলার খেলানো যেতে পারে কিন্তু সেক্ষেত্রে দলের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এসব সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতেই তুতুলের চোখে ঘুম নেমে এল। ঘুমের ঘোরে তার মনে হলো অন্ধকার ঘরটি যেন এক অপার্থিব আলোয় ভরে গেছে। সে অবাক হয়ে দেখল 'বড়দিনের সান্তা দাদু' একটা বেশ বড় পুঁটুলি নিয়ে তার সামনে এগিয়ে এলেন। তুতুল কিছু বলার চেষ্টা করলো কিন্তু গলা দিয়ে কোনো আওয়াজ বেরোলো না। সান্তাক্লজ দাদু একটু স্মিত হেসে পোটলা থেকে একটা সোনালী মোড়কে মোড়া টফি বললেন - "বাবু এটা খেয়ে নাও। সকালে দেখবে জ্বর একদম সেরে গেছে। মাঠে নেমে জলকে জেতাতে হবে তো। আর তোমাকে একটা বিশেষ উপহার দিই!" - এই বলে সান্তা দাদু তার বিখ্যাত পোটলা থেকে একটা ব্যাট বের করে তুতুলের খাটের পাশে রাখলেন।

আশীর্বাদের ভঙ্গিতে তিনি বললেন - ''ফাইনাল ম্যাচ এই ব্যাট দিয়ে খেলো। আমার আশীর্বাদ সব সময় তোমার সঙ্গে থাকবে।'' সান্তাক্লস দাদু ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তুতুলের হঠাৎ মনে হল সান্তা দাদুর দাড়ি-গোঁফের জঙ্গলের আড়ালে একজন পরিচিত মুখের ছোঁয়া সে যেন দেখতে পেয়েছে - ''অসীম দাদু কী?'' সে আর কিছু ভাবতে পারল না। তুতুলের ঘুম ভাঙলো ভোরের প্রথম আলো ফুটতে না ফুটতেই। সে অনুভব করল গায়ে আর একটুও জ্বর নেই বা মুখের বিস্বাদ ভাবও নেই। সে তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে নেমে এল। বাইরের ঘরে এসে সে অবাক হয়ে দেখল বাবা সংগ্রাম সংঘের মালি বিজয়দার সঙ্গে কথা বলছেন।

''আরে বিজয়দা এত সকাল সকাল?'' - তুতুলের অবাক মাখা গলায় জিজ্ঞাসা।

''তুতুলবাবু, অসীমদা তোমার জন্য একটা পার্সেল রেখে গিয়েছেন। সেটা দিতেই আজ সকালে এসেছি। আর তোমার তো জ্বর, এত তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে উঠে গেলে?'' - বিজয়দার কথা শেষ হতে না হতেই তুতুল ছোঁ মেরে লম্বাটে ধরণের বেশ বড়, ভারী পার্সেলটা হাতে তুলে নিল। প্যাকেট খুলতেই তার অবাক হওয়ার পালা- ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো একটা পুরনো কিন্তু সযত্নে রাখা একটা ক্রিকেট ব্যাট। ভালো করে একটা দিকে তাকাতেই সে উপলব্ধি করল - ''এই ব্যাটটাই তো আগের দিন রাতে সান্তাদাদু তাকে স্বপ্নের মধ্যে উপহার দিয়ে গিয়েছেন!''

যথাসময়ে হাজির হল সেই ঐতিহাসিক মুহূর্ত, এত বড় টুর্নামেন্টের ফাইনালে কলোনি স্কুল এই প্রথমবার খেলছে। চার্জার স্কুল প্রথমে ব্যাট করতে নামলো। শুরু থেকেই তারা দ্রুত গতিতে রানের পাহাড় গড়তে শুরু করলো। প্রথম আট ওভারে রান সংখ্যা দাঁড়াল বিনা উইকেটে আশি রান। এরমধ্যে চার্জার দলের অধিনায়ক অনিকেতের একারই ব্যক্তিগত সংযোজন পঞ্চাশ রান। আজ যেন সে অপ্রতিরোধ্য। ঠিক এই সময় ধূমকেতুর মতো জ্বলে উঠলো তুতুলের কেরামতি। আজ যেন সে এক অন্য জগতের বাসিন্দা, তার ফিল্ডিংয়ের মধ্যে যেন এক হিংস্র বাঘ ভর করেছে। নবম ওভারে সুকান্তর স্পিন বল স্টেপ আউট করে মারতে গেল অনিকেত। ব্যাটের কানায় লেগে বলটা উঠে গেল পয়েন্টের অঞ্চলের দিকে। নিশ্চয়ই সেটা বাউন্ডারিতে গিয়ে আছড়েপড়বে, কিন্তু না - সবাই অবাক হয়ে দেখল তুতুল অসুস্থ শরীরেও হাওয়ায় যেন উড়ছে। জন্টি রোডসের কায়দায় শূন্যে শরীর ছুঁড়ে সে বলটাকে তালুবন্দি করে ফেলল। প্রথম উইকেট পড়তেই কলোনির দলটা যেন নতুন অক্সিজেন পেল।

অপরদিকে, খেলার গতির বিরুদ্ধে এই আকস্মিক ছন্দ পতনে চার্জার দলটি যেন হতোদ্যম হয়ে গেল। তাদের পরপর উইকেট পড়তে লাগলো। বারো ওভারের শেষে তাদের রান সংখ্যা দাঁড়ালো চার উইকেটের বিনিময়ে একশো। ঠিক এই সময়ে ওদের দলের হাল ধরল উইকেটকিপার সন্তু। বেশকিছু বাউন্ডারি আর ওভার-বাউন্ডারি হাঁকিয়ে সে মাত্র কুড়ি বলেই ব্যক্তিগত তিরিশ রানে পৌঁছে গেল। সতেরো ওভারের শেষে রান সংখ্যা দাঁড়াল সাত উইকেটের বিনিময়ে দেড়শ। তুতুল আবার তার কেরামতি দেখালো। সন্তোষের বাউন্সার বল সন্তু 'পুল শট' মেরে বাউন্ডারির দিকে পাঠালো। নির্ঘাত সন্তুর খাতায় আরো চার রান যোগ হবে, কিন্তু না, কিন্তু তুতুল থাকতে সেটা হবার নয়। সে তার শরীরটাকে বলের দিকে ছুঁড়ে দিলো। বলটা বাউন্ডারির সীমানা পেরোনোর আগেই

আটকে গেল তুতুলের হাতে। এদিকে নিশ্চিত বাউন্ডারির কথা ভেবে সন্তু নিশ্চিন্তে ক্রীজ ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। তুতুল বলটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েই সজোরে ছুঁড়ে মারল সন্তুর দিকের উইকেট লক্ষ্য করে। অব্যর্থ লক্ষ্যে আছড়ে পড়ল সেটা। সন্তুর আউট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল চার্জার টিমের বাকি উইকেটগুলো। নির্ধারিত কুড়ি ওভারও তারা পুরোপুরি খেলতে পারল না, তার আগেই তাদের সবকটি উইকেটের পতন হল ১৬০ রানে।

ব্যাট করতে নেমে কলোনি ইস্কুলের শুরুতেই বিপর্যয়। প্রথম ওভারেই অধিনায়ক বাবলু ক্লিন বোল্ড হয়ে ফিরে গেল। পাঁচ ওভারে মাত্র চল্লিশ রানের বিনিময়ে পাঁচ উইকেট পড়ে গেল। দলের হাল ধরল তুতুল। সে আজ অসীম দাদুর উপহার দেওয়া ব্যাট নিয়ে খেলতে নেমেছে। তার ব্যাটে চার-ছয়ের বন্যা বইতে শুরু করল, এক অলৌকিক শক্তি যেন তার ভেতরে প্রবেশ করেছে! পরপর অনেকগুলো উইকেট পড়ে যাওয়া সত্ত্বেও একা 'কুম্ভের' মতো সে দলটাকে আগলে রাখল। তার উপর ভর করেই কলোনির দলটা খেলার দুই ওভার বাকি থাকতেই নিরাপদে কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছে গেল, তুতুলের ব্যক্তিগত রান সংখ্যা দাঁড়াল ১০৫। খেলা শেষে তাকে নিয়েই বাঁধভাঙ্গা উচ্ছ্বাসের প্লাবন বয়ে গেল। এমনকি বিপক্ষ চার্জার স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয়ও তার খেলা দেখে আপ্লুত হয়েছেন। তিনি তুতুলের বাবার কাছে তার প্রস্তাব পেশ করলেন - ''মৈনাকের মতো উঠতি কিন্তু প্রতিভাবান খেলোয়াড়ই আমাদের দলে খুব দরকার। আপনার যদি আপত্তি না থাকে তাহলে ওকে আমাদের স্কুলের ছাত্র হিসেবে মেনে নিতে রাজি আছি আর ওর সমস্ত খরচপাতির দায়িত্ব আমাদের।'' মনোজিতের দুই গাল বেয়ে আনন্দাশ্রু নেমে এল। সন্ধ্যেবেলায় ঘরে ফিরেই তুতুলের চোখে পড়ল ঘরের এক কোণে রাখা সেই পার্সেলের বড় প্যাকেটটি যার মধ্যে ব্যাটটি সযত্নে রাখা ছিল। প্যাকেটটা তুলে ধরতেই তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল ছোট্ট একটা চিরকুট, তাতে লেখা - ''প্রিয় বাবু, এই ব্যাটটি আমার খুবই প্রিয়, বহু সুখ-দুঃখের স্মৃতি এর মধ্যে লেগে রয়েছে। এই ব্যাটটি দিয়ে আমি সেই বিখ্যাত দ্বিশত রান করেছিলাম। এবারে সময় এসেছে তোমার হাতে অস্ত্রটি তুলে দেওয়ার। আমি জানি তুমি এটা সদ্ব্যবহার করবে এবং যথাযথ সম্মান দেবে। আমার আশীর্বাদ সবসময় তোমার সঙ্গে থাকবে। আরও বড় খেলোয়াড় হও।''

ইতি - তোমার দাদু

তুতুল বুঝতে পারল ব্যাটটিতে তার প্রিয় মানুষটির আশীর্বাদ লেগে থাকায় আজ ফাইনালে সে চূড়ান্তভাবে সফল হয়েছে। অসীম দাদুর প্রতি শ্রদ্ধায় তার মাথা নত হয়ে গেল এবং একটা স্বর্গীয় অনুভূতিতে তার মন পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো।

With Best Compliments From

A. D. TRADING COMPANY

244/1, A.P.C. Road, Kolkata-700 006

Supplier of Ferrous & Non Ferrous Metal

C.I. Merchant & General Order Suppliers.

Contact : Sarat Babu - 9831614463

Dinesh Babu - 9831169850

With Best Compliments From

CHAKRABORTY ELECTRICLA PVT. LTD.

সারান্ডার জঙ্গলে

বিধান তুঙ্গ (D/H3/12/1)

বসন্তের হাওয়া শরীর ছুঁতেই বুকের ভেতর বসত করা যাযাবর পাখিটা শীতঘুম ভেঙ্গে ডানা ঝাপটাল। ঘরের বাঁধন এবার ছিঁড়তে হবে। সময় এগিয়ে এলো উড়ান দেওয়ার। পিছনে পড়ে রইল মেকি নাগরিক সভ্যতা, স্বার্থপর চেনা পৃথিবী।

পাঁচ বন্ধু সপরিবারে চেপে বসলাম (৬টা ১০ মিনিটের) হাওড়া-বরবিল জন শতাব্দী এক্সপ্রেসে। সকলের প্রাথমিক ভদ্রতা ও সৌজন্যের ঝিমমুনি কাটিয়ে শুরু হয়ে গেল হাসি মজার ফোয়ারা। উচ্ছ্বল হাসির বিকট শব্দে মাঝে মাঝেই সহযাত্রীদের সপ্রশ্ন দৃষ্টিবান। কাকলি, দেবযানীর কেনা অন্নপূর্ণার ভান্ডার থেকে প্রতিনিয়ত হরেকরকম খাবারের যোগান থাকলেও হকার থেকে প্যানট্রি কর্মী কেউই হতাশ হল না।

অজগরের মত বৃহৎ যন্ত্রদানবটি আমাদের পেটে করে নিয়ে কু-ঝিক ঝিক করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছে। কাঁসাই নদী অতিক্রম করতেই বদলাতে শুরু করল। সবুজ ছেড়ে রুক্ষ পিঙ্গল বর্ণ ধারণ করল, সমতল থেকে তরঙ্গায়িত। একে একে মেদিনীপুর,ঝাড়গ্রাম, গিধনী পেরিয়ে ঢুকে গেল পড়ল ঝাড়খন্ডে। 'ঝাড়' শব্দের অর্থ জঙ্গল। স্বার্থক নামা... সবুজ জঙ্গলের বুক চিরে ছুটে চলেছে অজগর। ঘাটশিলার আগে থেকেই দূরে পাহাড়ের সারি উঁকি দিচ্ছিল, এখন পাশেই। দলমার পাহাড় শ্রেণী জোড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

জামসেদজীর শহরে আসতেই অনেক যাত্রী নেমে গেল। চলে এল চাইবাসা.... না! স্টেশনে একবার নামতেই হবে। এবার বাঙ্গোয়াপোসি স্টেশন আসতেই নেমে ছবি তুলছি। পেছন থেকে আওয়াজ পেলাম-

'কেয়া! ইঁহা ফটো খিচ রাহা হে? বরবিল যাইয়ে পাহাড়-জঙ্গল সব মিলেগা? মাথা ঘুরিয়ে দেখি টিসি সাহেব। আমাদের টিকিট বরবিল পর্যন্ত থাকলেও নেমে যাব বড়জামদায় যা আমাদের গন্তব্যস্থল

থেকে কাছে হবে। নির্ধারিত ১২টা ৪০ মিনিটের পরিবর্তে প্রায় ১ টায় বড়া জামদায় (৩৯১ কিমি) ট্রেন পৌঁছাল। স্টেশনে অসংখ্য ওয়াগন দাঁড়িয়ে রয়েছে রাশি রাশি লোহা খনির পাথর বহনের অপেক্ষায়।

অপেক্ষারত উইঙ্গারে গাদাগাদি করে সবাই ওঠে পড়লাম।

কলসিতে ভরা জলের মতো থেকে থেকেই চলকে উঠছি। কখনও পাহাড়ি পথের আদুল শরীরের বেখেয়ালিপনায় আবার কখনও উড়ে ভেসে চলা মেঘ গুলোর মন মাতানিয়া তালে। পথের ধারে সেখানে ঈশ্বরের তুলির টানে মনচোরা ক্যানভাস।

ডান পাশ থেকে বাঁ পাশ চোখ দুটোকে ভাসাতেই লাল লাল ক্লেদময় পরিবেশ ছাড়িয়ে সবুজ উপত্যকার আবির্ভাব। রাস্তা এঁকেবেঁকে চলেছে শাল মহুয়ার বনভূমিতে।

-- দাদা, একটু দাঁড়াবেন? কথা বলব মাথা উঁচিয়ে অপেক্ষা করে থাকা বনস্পতির সাথে। কার জন্য এদের এই অনন্তকাল অপেক্ষা? কি নাম জায়গাটির?

থাক, নামে কি আসে যায়? চোখের দেখা আর প্রাণের কথা যেখানে মিলে যায় সেখানেই তো ফুটে ওঠে, না দেখা সেই স্বর্গের পটভূমি।

মহুয়ার নেশাতুর সুবাস আর শাল-পলাশের ছায়া মাখতে মাখতেই পৌঁছে গেলাম শেলের অতিথিনিবাস 'মেঘালয়' ভবনে। 'মেঘাহাতুবুরুর' এই অতিথিনিবাসটি বড়াজামদা থেকে দূরত্ব ২৮ কিমি।

'মেঘাহাতুবুরু' .... যে পাহাড়ে মেঘ হেঁটে বেড়ায়। সমুদ্রতল থেকে প্রায় ২৬০০ ফুট উঁচুতে অবস্থিত এই শৈলবাস। এখানে নাকি দুটি ঋতু - শীত আর বর্ষা! 'মেঘাহাতুবুরু'.....

— কি, শোনা শোনা লাগছে?

— বুরু দুরু কি যেন শুনেছিলাম!

— হ্যাঁ, হ্যাঁ সেই ছোটবেলায় ভূগোলের বই। নোয়ামুন্ডি, বুদাবুরু, কিরিবুরু, পানশিরাবুরু.....

— হ্যাঁ ঠিকই ধরেছেন, লোহার খনির জন্য বিখ্যাত। ধরিত্রীর বুক চিরলেই কিংবা পাহাড় ভাঙলেই বেরিয়ে আসবে লোহা। শুধু লোহার খনি নয় এটি এশিয়ার বৃহত্তম ও গভীর শালের জঙ্গল। প্রায় ৮২০ বর্গ কিমি জুড়ে রয়েছে সারান্ডার বনভূমি। গহীন অরন্যের অন্তরালে লুকিয়ে রেখেছে অসংখ্য পাহাড়, ঝরনা, পাখি, বন্য প্রাণীদের।

রিসেপশনে পৌঁছে জানা গেল পাঁচটির পরিবর্তে তিনটি ঘর দেবে। অরিন্দম-অসীমের নিরলস প্রচেষ্টা সত্বেও সমাধান করা গেল না কেয়ারটেকারের বদান্যতায়। মিশমিশে কালো সারান্ডার শয়তানটি দুটি ঘর ১২ ও ১৩ তারিখের পরিবর্তে ১৩ ও ১৪ তারিখে বুক করে রেখেছে।

ওরে ব্যাটা শয়তান, তোর ঘাড়হীন মুন্ডু, ট্যারা চোখ দিয়ে যতই কুবুদ্ধি বার কর! আমাদের আনন্দ মাটি করতে পারবি না। ছোটবেলা থেকেই কত আওড়েছি...'যদি হও সুজন, তেঁতুল পাতায়

নয়জন।' বউ, বাচ্চা, বর — ৩ শ্রেণীতে ভাগ হয়ে তিনটি ঘর দখল নিলাম। কুক্কুট মাংস সহযোগে দ্বি-প্রাহরিক অপূর্ব স্বাদের আহারে উদরপূর্তি আনন্দের আবেশ এনে দিল।

অতিথি নিবাস এর পেছনেই 'সানসেট ভিউ পয়েন্ট।' এখান থেকে দৃশ্যমান হয় বিস্তৃত সারান্ডার জঙ্গল। অসংখ্য সমান্তরাল পাহাড়ের শ্রেণি। অঞ্চলটিতে রয়েছে পাশাপাশি দুটি শৈলবাস। 'কিরিবুরু-মেঘাহাতুবুরু'। কিরিবুরু হল উড়িষ্যার কেওনঝড় জেলার অন্তর্গত আর মেঘাহাতুবুরু হল পশ্চিম সিংভূম জেলার অন্তর্গত। না, না! বেশি দূরে নয়। মাত্র কয়েকশো মিটারের ব্যবধান। এখানে 'কিয়ম' (Kiriburu iron ore mine) ও 'মিয়ম' (Meghahatuburu iron ore mine) খনি দুটি শেলের (SAIL) তত্ত্বাবধানে রয়েছে। বিভিন্ন ইস্পাত কারখানায় লোহার আকরিক এখান থেকেই যায়। বিশেষত বোকারো স্টিল প্লান্টে। এখানকার অধিকাংশ অঞ্চলই শেলের অধীনে, সবকিছুর জন্যই পারমিশন নিতে হবে সেল কর্তৃপক্ষের কাছে। তাই হোটেলের সংখ্যাও নগণ্য। এই অঞ্চলের পর্যটন হোটেলের ওভাবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি। ঝাড়খন্ড ও উড়িষ্যা সরকারের কিছু বনবাংলো অবশ্য রয়েছে। জঙ্গলের রাজ্য ঝাড়খণ্ড। জঙ্গলমহলের নামগুলোও ভারী অদ্ভুত। শালবনি, আসনবনি, মহুলবনী..... তারপর আর ডালকাটি, ডাঙ্গুয়াপোসি, বাংরিপোসি, বাগমুন্ডি, নোয়ামুন্ডি.... কিরিবুরু, পানসিবুরু, মেঘাহাতুবুরু....। এক সময় এগুলি ছিল মানভূম, সিংভূম, বীরভূমের অংশ। ভঞ্জভূম চলে গেছে উড়িষ্যায়, ধলভূমের অধিকাংশ এলাকা; মানভূমের কিছুটা, সিংভূম আর রাঁচি নিয়ে বর্তমান ঝাড়খন্ড। মানভূমের কিছুটা আমাদের বাংলার পুরুলিয়া, বাঁকুড়া। পলাশীর যুদ্ধের পর ১৯৬৫ সালে বাংলা বিহার উড়িষ্যার নবাব নাজম-উদ্-দৌল্লা পুরো ঝাড়খন্ড তুলে দিয়েছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে। কিন্তু ঝাড়খন্ডের আদিকাল থেকে বসবাসকারী স্বাধীনচেতা আদিবাসীরা বিদ্রোহ করল। পাহাড়-জঙ্গলের আদিবাসীদের ছিল অনেক রাজা। ওই ভূমগুলিতে ছিল তাদের অখন্ড প্রতাপ। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গুলোকে তারা ট্যাক্স তো দিলই না, উল্টে শুরু করে দিলো যুদ্ধ। অসম শক্তির কারণে তারা গেরিলা যুদ্ধ করত। প্রায় ৯০ বছর ধরে বিভিন্ন রাজারা যুদ্ধ চালিয়ে গেছে। রাজাদের বাগে আনতে পারলেও আদিবাসীদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি!

৭০০ পাহাড়ের দেশ" এই সারান্ডার মূলত হো, ওঁরাও, মুন্ডা ও ভূমিজ সম্প্রদায়ের বাস। সাঁওতাল আদিবাসীদের সংখ্যা এখানে নগণ্য। সারান্ডার শব্দটি হো উপজাতির শব্দ। 'মেঘাহাতুবুরু'... বুরু শব্দের অর্থ পাহাড় অর্থাৎ যে পাহাড় মেঘ ছুঁয়ে রয়েছে। 'কিরিবুরু' — কিরি শব্দের অর্থ পোকা অর্থাৎ পোকার পাহাড়। সবই 'হো' উপাজাতির শব্দ থেকেই উৎপত্তি।

মেঘাহাতুবুরু সানসেট পয়েন্ট দাড়িয়ে আনমনে এসব ভাবছিলাম। সামনে আদিগন্ত সবুজ পাহাড়ের ঢেউ। মাথার উপর মেঘের টোপর পরে রয়েছে। পাহাড়ের বুক ভেঙে ধাপে ধাপে নেমে গেছে শাল, পিয়াল মহুয়ার বনস্পতিরা। জঙ্গলের হাওয়ার শনশন আওয়াজ টুকু ছাড়া কি ভীষণ নিস্তব্ধতা এখানে বিছানো! আস্তে আস্তে রোদ্দুর আসে। ক্লান্ত মেঘের দল জিরিয়ে নিতে শিখরের বুকে এসে থামে। গোধূলির মন কেমন করা আলো ছড়িয়ে পড়ে পাহাড়-জঙ্গল চরাচর জুড়ে।

সন্ধ্যা নামে। দূরে আকাশের বুক চিরে অশনি সংকেত। দেখতে দেখতে সারা দিনের গরম হাওয়া হঠাৎ কোথায় উধাও হয়ে গেল! দমকা শীতল হাওয়ার সঙ্গে বজ্রনিনাদ সহ বিদ্যুতের ঝলকানি।

আমাদের অর্থাৎ পঞ্চপান্ডবের ঘরেই জমে উঠে সান্ধ্যকালীন আড্ডা। আর সুরেলা গানে ছড়িয়ে পড়ে ভালো লাগার আবেশ। চারপাশের পাহাড়ি নিস্তব্ধতা, নিঃসঙ্গতার সাথে এ সুর ভীষণ ভাবে মিশে যায়। রাত গভীর হয় ঘুম নেমে আসে ক্লান্ত, অবসন্ন, শীতার্ত চোখে।

আজ বাংলা বছরের শেষ দিন। প্রাতঃকালীন শুভেচ্ছা বিনিময় করে শুরু হল দিনটি। 'সারান্ডার শয়তান' ম্যানেজার অসহযোগিতা, মিথ্যাচারিতা সত্বেও দুটো গাড়ি পাওয়া গেছে। আমাদের নিয়ে যাবে কয়েকটি দর্শনীয় স্থানে। প্রাতরাশঃ খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম 'কুন্ডল' জলপ্রপাতের উদ্দেশ্যে। স্থানীয় কালী মন্দিরে রাম নবমীর সকালে যথেষ্ট ভিড়। মন্দির ও জনপদ ছাড়িয়ে গাড়ি এগিয়ে চলল ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে। নিকষ কালো নিটোল ওঁরাও রমনীর মত রাস্তা এঁকেবেঁকে এগিয়ে চলেছে। ছোট ছোট পায়ে চলার পাহাড়ি পথ রক্তাভ শরীরটা নিয়ে এঁকেবেঁকে গেছে পাহাড়ের আড়ালে, জঙ্গলের গভীরে। রাস্তায় গাড়ি কিংবা স্থানীয় আদিবাসীদের দেখা প্রায় নেই। ধীরে ধীরে পাহাড়ের উচ্চতা ও বনভূমির গভীরতা কমে যেতে থাকল। গাড়ি মসৃণ রাস্তা ছেড়ে লাল মাটির প্রান্তরে। দিগন্তহীন প্রান্তর চিরে লাল মাটির পথ। কোথাও কোথাও একাকী নিঃসঙ্গ মহুয়া বা বৃহৎ গুঁড়ির আমগাছ অতীত সবুজ অরণ্যের স্মৃতি বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সামনেই ছোট্ট একটা গ্রাম ধনুরজয়পুর। গ্রাম দেখে নূপুর অরিন্দমের উদ্দেশ্যে বলে উঠলো — দেখো, কেনিয়ার আদিবাসীদের গ্রামের মতো না?

উগান্ডা হোক বা সারান্ডা! এই সমস্ত আদিবাসী গরিব মানুষদের বোধ হয় সর্বজনীন মিল রয়েছে! সামনে রয়েছে উঁচু কাঠের বেড়া। বন্য জন্তু কিংবা হাতির পাল থেরে রক্ষা পেতে তৈরি করেছে। সারান্ডা হাতির মুক্তাঞ্চল। যখন খুশি তছনছ করে দিতে পারে ঘরবাড়ি, ফসলের ক্ষেত। পিষে দিতে পারে আদিবাসীদের। এছাড়াও নাকি অসংখ্য বন্য প্রাণী রয়েছে। গ্রাম ছাড়িয়ে অসমান রাস্তা দিয়ে দুলতে দুলতে এগিয়ে চললাম ফুলবাড়ী জঙ্গল ক্যাম্পের দিকে। আবার ধীরে ধীরে শাল, পিয়ালের অরণ্য ঘিরে ধরছে চারিদিক থেকে। নিবিড় বনস্পতির মাথা দিয়ে ঢোকা সৌর কিরণ পড়ে থাকা পাতার সাথে লুকোচুরি খেলছে। দূরে নীল আকাশের দিকচক্রবাল ছুঁয়ে অনুচ্চ টিলার পাহাড়। মাঝে মাঝেই রাস্তা গভীর ভাবে কেটে চলে গেছে জলধারার শুষ্ক নালা। আমরা বারবার গাড়ী থেকে নেমে সাহায্য করছিলাম চালককে। অবশেষে গাড়ি থামলে একটা ছোট্ট শিব মন্দিরের সামনে। স্বপ্নেশ্বর মন্দির। এখানেই কাঠুরেরা পুজো দেয় এবং ক্যাম্প করে। এখান থেকেই ঢাল বেয়ে নেমে এলাম কুন্ডুল ঝর্ণার কাছে। একটি ছোট্ট নদী পাহাড় থেকে নামার পথে তৈরি করেছে এই ঝর্ণা। উচ্ছ্বল কিশোরীর মতো লাফিয়ে নামছে। কলকল ধ্বনি তুলে জানান দিচ্ছে নিজের অবস্থান। সবাই আবেগেও উচ্ছ্বাসে ক্যামেরাবন্দি করে রাখলো সুন্দর মুহূর্তগুলোকে।

এবার আমাদের গন্তব্য ঝিকরি জলপ্রপাত। মেঘহাতাবুরু থেকে ১২ কিমি পথ। মিনিট ৪০শের মধ্যেই আমাদের নামিয়ে দিল গন্তব্যের নিকটে। আসার পথে বোলানী লৌহ খনির কিয়দংশ

দেখা যাচ্ছিল। এই ঝর্ণার সমস্ত জল বোলানী খনি সংগ্রহ করে। এখান থেকে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ১০ মিনিটের পথ। সামনেই পেলাম হিল হিলে সরু রুপোলি জলধারা। ছবি তুলতে গিয়ে পিছিয়ে পড়লাম। বড় ভালো লাগছিল নির্জনে নিস্তব্ধতায় একা দাঁড়িয়ে থাকতে। চারপাশে ছড়ানো বন্ধনহীন পৃথিবী। নগরীর ইঁট-কাঠ-পাথরের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে মনে যেন শ্বাস ফেলে।

জলধারা অনুসরণ করে এগিয়ে চললাম ঘন জঙ্গলের মধ্যে। গাছের পাতা চাঁদোয়ার মত আটকে রেখেছে রবির কিরণ। ঝাঁক ঝাঁক প্রজাপতি ইতি উতি উড়ে চলেছে। দূর থেকেই শব্দ আসছিল কানে। পৌঁছে দেখি সবাই আনন্দে আত্মহারা। প্রায় ১০০ ফিট উপর থেকে পাহাড়ের গা বেয়ে জলরাশি নিচে ঝাঁপিয়ে পড়ে জলধারা সৃষ্টি করেছে। এখানেই প্রকৃতি ক্ষান্ত না হয়ে আবার রামধনু সৃষ্টি করেছে। বাতাসের গুড়ি গুড়ি জলধারা উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে কুয়াশাঘন অদ্ভুত মায়াময় পরিবেশ রচনা করেছে। চারিদিকে শুধুই পতিত জলরাশির কলতান। বন্য গন্ধ, ঝরণার অবিরত শব্দ মনকে বিবশ করে দেয়। ড্রাইভার সনুর ডাকে ফেরার পথ ধরি।

আমাদের অনুমতি নেই তাই মাইনের ভেতরে যাওয়ার ছাড়পত্র পেলাম না। সনুর বুদ্ধিমত্তার কারণে দূর থেকে কিরিবুরু লৌহ খনি দেখার সৌভাগ্য হল। দেখা হলো না গভীর থোলকাবাদ অরণ্যানী, পাঁচরি জলপ্রপাত, তোয়বা জলপ্রপাত, লেপার্ড কেভ প্রভৃতি।

মেঘালয় অতিথিনিবাসে ফিরেই ‘সানসেট পয়েন্ট’ এ পৌঁছে এলাম। দূরে পাহাড়ের মাথা থেকে লাল সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়েছে শাল পলাশের ডালে ডালে। বিকেল ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছিল সামনের সবুজ পাহাড়ের মাথায়। ফুরফুরে চৈতি হাওয়ায় ভেসে আসছিল মহুয়ার গন্ধ। আড়ালে বসে সন্তর্পনে কু-কু করে ডাকছিল কোকিল কিংবা ডাহুক। প্রকৃতির রূপ রস গন্ধের ঐকতানে ক্ষয়ে যাওয়া বেলার গভীরে একটু একটু করে হারাচ্ছিলাম নিজেকে। মনও পাখা ঝাপটাচ্ছিল ওড়ার নেশায়।

With Best Compliments From

PAGODA ENGINEERING PVT. LTD.

With Best Compliments From

SHREE JAIN HOSPITAL
& RESEARCH CENTRE

A MULTI SPECIALITY HOSPITAL

With Best Compliments From

Gautam Das
89109 21546

Tamal Samanta
98360 47312

G.T. CONSTRUCTION

DEVELOPER & CONTRACTORS

Office :
65, Joy Narayan Santra Lane
Howrah-1